রামধনু
নিকোলাই নোসভ
শিকার রান্নাবান্না
ভিক্তর গোলিয়াভকিন
যখন ছোট
অহমেদ ইয়াখিয়ায়েভ
মৌমাছি
খালিদা হাজিলভা
সাগরের প্রজাপতি
সেমিওন শুরতাকভ
‘শুনছি, ঘাস বাড়ছে...’
বৃষ্টি আর নক্ষত্র
আলেক্সান্দর বারভ
তুলিকা
আন্দ্রেই দুগিলেভ
সামেবতের টুপি
ভিক্তর দ্রাগুনস্কি
সার্কাসের মেয়ে
ভ্লাদিমির জেলেজনিকভ
ছেলেটার জন্য রঙ
ভ্লাদিস্লাভ ক্রাপিভিন
বৃষ্টি আর নক্ষত্র

প্রকাশকের নিবেদন

আদরের কিশোর বন্ধুরা,

নিশ্চয় তোমরা সবাই মজার ঘটনা শুনে হাসতে ভালোবাসো। তাছাড়া জানোই তো, ঘটনা যত মজার হোক তা থেকে শিক্ষালাভও কম হয় না।

সোভিয়েত দেশের নানা জাতির নামকরা লেখকদের গল্প ও কাহিনী আছে বইটিতে। পড়লে জানতে পারবে সোভিয়েত ছেলেমেয়েদের কথা, কেমন করে তারা দিন কাটায়, কেমন তাদের ছুটি, কী কী মজার ঘটনা ঘটে তাদের জীবনে।

তবে শুধু মজার গল্পই এতে নেই। অনেক কাহিনীর বক্তব্য বেশ গুরুতর — যেমন, সত্যিকারের মানুষ হতে হলে কী রকম হতে হবে, কী ধরনের সদ্‌গুণ গড়ে তোলা দরকার।

সংকলন শুরু হয়েছে বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক নোসভের গল্প দিয়ে। তাঁর মজার বই ভারতীয় ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে, হয়ত পড়ে থাকবে।

আমাদের এই 'রামধনু' সিরিজে বাঙলা ভাষায় আরও বই বেরুবে: 'স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা' (ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনকে নিয়ে লেখা গল্পসংগ্রহ), বিখ্যাত সোভিয়েত শিশু সাহিত্যিক আ. গাইদার, ন. দুবভ, আ. আলেক্সিন, ভ. মেদভেদেভের কাহিনী, আ. বেলিয়ায়েভের কল্পকাহিনী 'উভচর মানুষ', পশুপাখি, প্রকৃতি নিয়ে চমৎকার চমৎকার গল্প আর বই।

বইগুলি যদি তোমাদের ভালো লাগে, উপকার হয়েছে বলে মনে করো, তাহলে আমরা খুশি হব।

কেমন লাগল, আরও কী চাও তা লিখে জানিও নিচের ঠিকানায়:

প্রগতি প্রকাশন,
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

নিকোলাই নোসভ
মিশকার রান্নাবান্না

ভিক্তর গোলিয়াভকিন
যখন ছোট

অরসেন ইয়াখিয়ায়েভ
মৌমাছি

খালিদা হাসিলোভা
সাগরের প্রজাপতি

সেমিওন শুরতাকভ
'শুনছি, ঘাস বাড়ছে...'

বৃষ্টি আর নক্ষত্র

(ছোটদের গল্প)

আলেক্সান্দর বাওভ
তুলিকা

আন্দ্রেই দুগিনেৎস
ঝামেতের টুপি

ভিক্তর দ্রাগুনস্কি
সার্কাসের মেয়ে

ভ্লাদিমির জেলেজনিকভ
ছোটোটার জন্য রঙ

ভ্লাদিস্লাভ ক্রাপিভিন
বৃষ্টি আর নক্ষত্র

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

«ЗВЕЗДЫ ПОД ДОЖДЕМ»

(Рассказы и повести для детей)

На языке бенгали

সূচী

নিকোলাই নোসভ

মিশকার রান্নাবান্না

সেবার মায়ের সঙ্গে আমরা গাঁয়ের বাগান-বাড়িতে আছি। মিশকা এল দিনকতক বেড়াতে। কী যে আনন্দ হল বলবার নয়। ও না থাকায় ভারি একলা লাগছিল। মা-ও খুশি হল খুব। বললে, 'যাক, এসেছিস বাঁচা গেল। দু'জনে মিলে তোদের আনন্দে কাটবে। তবে শোন, কাল আমায় শহরে যেতে হবে, দিন কতক আটকে যেতেও পারি। আমি না থাকলে অসুবিধা হবে না তো?'

আমি বললাম, 'কিছু অসুবিধা হবে না, আমরা তো বাচ্চা নই!'

'তোদের কিন্তু নিজেই রান্না করে নিতে হবে, পারবি?'

'পারব বইকি', বললে মিশকা, 'না পারার কী আছে।'

'বেশ, তাহলে সুরুয়া আর পরিজ রাঁধিস। পরিজ রাঁধা সবচেয়ে সোজা।'

'তা পরিজই রাঁধব, কী আর হয়েছে!' বললে মিশকা।

আমি বললাম, 'দেখিস মিশকা, রাঁধতে যদি না পারিস? আগে তো কখনো রাঁধিস নি।'

'ভাবনা নেই, মা কেমন করে রাঁধে তা আমার দেখা আছে। পেট ভরেই খাবি, উপোস দিতে হবে না। এমন পরিজ রাঁধব যে হাত চাটবি।'

সকালে আমাদের দুদিনের মতো রুটি আর চায়ের সঙ্গে খাবার জন্যে কিছু জ্যাম রেখে মা কোথায় কী আছে দেখিয়ে দিলে, বোঝালে কী করে সুরুয়া আর পরিজ রাঁধতে হয়, কতখানি খুদ দিতে হবে, এই সব। আমি সব শুনলাম, তবে মনে রইল না কিছু। ভাবলাম, 'কী দরকার মনে রেখে, মিশকা তো সব জানেই।'

তার পর মা চলে গেল, আমি আর মিশকা ঠিক করলাম নদীতে গিয়ে মাছ ধরব। ছিপটি ঠিক করলাম, কেঁচো খুঁড়লাম।

আমি বললাম, 'আরে দাঁড়া, দাঁড়া! নদীতে গেলে রান্না করবে কে?'

'রান্না করে কী হবে?' বললে মিশকা, 'যত ঝামেলা! গোটা পাঁউরুটিটা খেয়ে কাটিয়ে দেব। আর রাতের খাবারের বেলায় পরিজ রাঁধা যাবে। পরিজ তো বিনা রুটিতেও খাওয়া যায়।'

রুটি কেটে জ্যাম মাখিয়ে চললাম নদীর দিকে। প্রথমটা একটু জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে চান করে নিলাম, তারপর শুলাম বালির ওপরে। রোদ পোয়াতে পোয়াতে চিবুতে লাগলাম জ্যাম-মাখা রুটি। তারপর লাগলাম মাছ ধরতে। তবে মাছ ঠোকরাচ্ছিল কম। সারা দিনে ধরা গেল কেবল গোটা দশেক চুনোপুঁটি। পুরো দিনটা নদীর ধারে কাটালাম। বাড়ি ফিরলাম সন্ধ্যেয়, পেট চনচন করছে খিদেয়।

বললাম, 'মিশকা, তুই তো ওস্তাদ, কী রাঁধবি বল তো? তবে ঝটপট, খিদে পেয়েছে খুব।'

'পরিজ রাঁধা যাক,' বললে মিশকা, 'পরিজ রাঁধাই সবচেয়ে সোজা।'

'তা বেশ, পরিজই হোক।'

উনুন জ্বালানো গেল, প্যানে গমের খুদ ঢাললে মিশকা। আমি বললাম:

'একটু বেশি করে দে, খিদে পেয়েছে খুব।'

মিশকা প্যান ভর্তি করে সুজি চাপাল, তারপর জল ঢাললে কানায় কানায়। বললাম:

'জল একটু বেশি হল না? ভয়ানক পাতলা হয়ে যাবে যে।'

'আরে না, মা সব সময় তাই করে। তুই শুধু উনুনটা দেখিস, আমি রেঁধে যাব, ভাবনা নেই।'

আমি উনুন দেখি, কাঠ জোগাই আর মিশকা পরিজ রাঁধে, মানে ঠিক রাঁধে না, প্যানটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে, নিজে থেকেই রান্না হয়ে যাচ্ছে পরিজ।

একটু পরেই আঁধার হয়ে এল, আমরা আলো জ্বাললাম। হঠাৎ দেখি কি, প্যানের ঢাকনাটা উঁচু হয়ে উঠেছে আর তার ফাঁক দিয়ে সুজি বেরিয়ে আসছে।

বললাম, 'মিশকা, কী ব্যাপার বল তো, সুজি পড়ে যাচ্ছে কেন?'

'কোথায় পড়ে যাচ্ছে?'

'কোথায় আবার, চুলোয়! বেরিয়ে আসছে প্যান থেকে।'

মিশকা একটা চামচে দিয়ে বেরিয়ে-আসা সুজির পিণ্ড ফের ঢোকাতে লাগল প্যানে। কিন্তু যতই ঠাসে, দাবানো যায় না, প্যানের মধ্যে যেন ফেঁপে উঠেছে, বেরিয়ে আসছে কেবলি।

মিশকা বললে, 'ঠিক বুঝছি না তো এমন বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে কেন। হয়ত তৈরি হয়ে গেছে, কী বলিস?'

আমি চামচে নিয়ে চেখে দেখলাম, সুজি একটুও নরম হয় নি। বললাম, 'মিশকা, জলটা কোথায় উধাও হল? ভেতরটা একেবারে শুকনো।'

বললে, 'কে জানে, জল ঢেলেছিলাম তো অনেক। প্যানে ফুটো নেই তো?'

পরীক্ষা করে দেখা গেল প্যানটা। কোনো ফুটোই নেই।

'তাহলে বোধ হয় বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে,' বললে মিশকা, 'আরো ঢালতে হবে।'

প্যান থেকে কিছুটা সুজি তুলে ফেলে জল ঢাললে মিশকা। ফের সেদ্ধ হতে থাকল। সেদ্ধ হচ্ছে, হচ্ছে, হচ্ছে, হঠাৎ আবার ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল সুজি।

'আ ম'লো যা!' বললে মিশকা, 'জ্বালালে দেখছি।'

ফের চামচ নিয়ে আরও কিছু সুজি বার করে নিলে মিশকা, জল ঢাললে পুরো এক মগ। বললে, 'দেখলি তো, তুই ভাবছিলি পাতলা হয়ে যাবে। কত জল ঢালতে হচ্ছে দেখছিস?'

সেদ্ধ হতে লাগল। কিন্তু আচ্ছা ফ্যাসাদ তো! আবার ঠেলে উঠছে সুজি।

আমি বললাম:

'তুই বোধ হয় সুজি ঢেলেছিস বেশি। ফেঁপে উঠছে, প্যানে আঁটছে না।'

'তাই মনে হচ্ছে,' বললে মিশকা, 'তোরই দোষ! বলে কি না, বেশি করে দে, খিদে পেয়েছে!'

'বারে, আমি কোত্থেকে জানব কত দিতে হয়? তুই তো নিজেই বললি যে রাঁধতে জানিস।'

'রাঁধবই তো! শুধু জ্বালাস নে।'

'বেশ, জ্বালাব না।'

দূরে চলে গেলাম আমি, আর রাঁধতে লাগল মিশকা, মানে ঠিক রাঁধে না, প্যান থেকে সুজির পিণ্ড বার করে করে এক একটা প্লেটে রাখে আর জল ঢালে। রেস্তোরাঁর মতো সারা টেবিল ভরে গেল প্লেটে।

আর পারলাম না, বললাম:

'কী শুরু করেছিস তুই! এ ভাবে রান্না চললে তো রাত পুইয়ে ভোর হয়ে যাবে।'

'আর তুই কী ভেবেছিস? ভালো ভালো রেস্তোরাঁয় পরের দিনের জন্যে খাবার রাঁধতে শুরু করে সন্ধে থেকে, তা জানিস?'

বললাম, 'বড়ো বললেন, রেস্তোরাঁয়! ওদের তো আর তাড়া নেই, কত রকম খাবার।'

'আমাদেরই বা তাড়া কিসের?'

'আমাদের যে খেতে হবে, ঘুমতে হবে। এ দিকে রাত বারোটা বাজতে চলল।'

বললে, 'ঘুমোবার ঢের সময় পাবি।'

এবং ফের আরেক মগ জল! তখন টনক নড়ল আমার। বললাম, 'তুই যে কেবলি ঠাণ্ডা জল ঢালছিস। সেদ্ধ হবে কী করে?'

'তার মানে বিনা জলেই সেদ্ধ হবে বলতে চাস?'

বললাম, 'অর্ধেকটা সুজি বার করে নিয়ে বেশি করে জল ঢাল। তবে সেদ্ধ হবে।'

আমি ওর কাছ থেকে প্যানটা নিয়ে অর্ধেকটা খালি করে দিলাম। বললাম, 'এই বার জল ঢাল একেবারে কানায় কানায়।'

মিশকা মগটা নিয়ে বালতিতে ডোবাল। বললে, 'জল আর নেই। সব শেষ।'

আমি বললাম, 'কী করি তাহলে? যা অন্ধকার রাত, জল আনতে যাব কী করে! কুয়োই চোখে পড়বে না।'

'বাজে বকিস না। এক্ষুণি নিয়ে আসছি।'

দেশলাই নিয়ে বালতিতে দড়ি বেঁধে ও চলে গেল কুয়োর দিকে। ফিরল এক মিনিট পরেই।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু জল কোথায়?'

'জল... ওই ওখানে, কুয়োতে।'

'কুয়োতে তা সবাই জানে। জল-ভরা বালতিটা কোথায়?'

'বালতিটাও ওই কুয়োতে।'

'কুয়োতে মানে?'

'মানে কুয়োতে।'

'পড়ে গেল?'

‘ফসকে গেল।’

বললাম, ‘ইস, তোকে নিয়ে যে কী করি! না খাইয়ে মারবি আমায়। এখন জল আনি কী করে?’

‘কেটলি দিয়ে চেষ্টা করব।’

আমি কেটলিটা নিয়ে বললাম:

‘দড়িটা দে।’

‘দড়ি নেই।’

‘নেই মানে, গেল কোথায়?’

‘ওইখানে।’

‘ওইখানে মানে?’

‘মানে... ওই কুয়োতে।’

‘তার মানে দড়িশুদ্ধ বালতিটা পড়ে গেছে?’

‘মানে... হ্যাঁ।’

অন্য একটা দড়ি খুঁজতে শুরু করলাম। কোথাও নেই।

মিশকা বললে, ‘ভাবনা নেই, এখনি গিয়ে পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে আনব।’

বললাম, ‘পাগল হয়েছিস! ঘড়িটা একবার দেখ, সবাই ঘুমুচ্ছে।’

এই সময় হঠাৎ যেন ইচ্ছে করেই আমাদের দু'জনের ভারি তেষ্টা পেয়ে গেল। মনে হল এক মগ জলের জন্যে একশ রুবলও দিতে পারি। মিশকা বললে:

‘সব সময়ই তাই হয়: জল না থাকলেই তেষ্টা পায় বেশি। সেইজন্যেই মরুভূমিতে অত তেষ্টা পায়, জল নেই তো।’

বললাম, ‘পাণ্ডিতি রেখে দড়ি আন।’

‘আনব কোত্থেকে। সব খুঁজে দেখেছি। তার চেয়ে আয় ছিপের সুতো দিয়ে বাঁধি।’

‘ভার সইবে তো?’

‘সইবে।’

‘যদি না পারে?’

‘যদি না পারে, তাহলে... ছিঁড়ে যাবে।’

‘বড়ো বললেন।’

ছিপের সুতো খুলে কেটলিতে বেঁধে চললাম জল আনতে। কুয়োতে কেটলিটা নামিয়ে জল ভরলাম আমি। তারের মতো টান টান হয়ে উঠল সুতো, এই বুঝি ছেঁড়ে।

বললাম, ‘বুঝতে পারছি, ছিঁড়বে।’

‘খুব আস্তে আস্তে যদি তুলতে পারিস, তাহলে ছিঁড়বে না,’ বুদ্ধি দিলে মিশকা।

আস্তে আস্তেই তুলতে লাগলাম। কিন্তু জলের ওপর উঠতে না উঠতেই, ঝপাং — উধাও হল কেটলি।

'ছিঁড়ে গেল?' জিজ্ঞেস করলে মিশকা।

'ছিঁড়বেই তো। এবার জল তুলি কিসে?'

মিশকা বললে, 'সামোভার দিয়ে।'

'তার চেয়ে বরং সামোভারটাই কুয়োয় ফেলে দে, হাঙ্গামা বাঁচবে। দড়ি, দড়িই যে নেই।'

'তাহলে প্যান দিয়ে।'

বললাম, 'কী পেয়েছিস, এটা বাসনের দোকান নাকি?'

'তাহলে গেলাস দিয়ে।'

'এক এক গ্লাস করে জল তুলতে রাত পুইয়ে যাবে।'

'তাহলে কী করা যায়। পরিজটা তো রান্না করতে হবে। আর তেষ্টাও পেয়েছে বিদঘুটে।'

বললাম, 'দাঁড়া, বরং মগটায় তোলা যাক। যতই হোক গেলাসের চেয়ে তো বড়ো।'

বাড়ি ফিরে ছিপের সুতো দিয়ে মগটাকে এমনভাবে আমরা বাঁধলাম যাতে কাত না হতে পারে। গেলাম কুয়োর কাছে, এক এক মগ জল তুলে খেলাম। মিশকা বললে:

'সব সময়ই এই হয়। যখন তেষ্টা পায় মনে হয় গোটা সমুদ্রই বুঝি খেয়ে ফেলব, আর খেতে শুরু করলে দেখবি এক মগ খেলেই হয়ে যাচ্ছে। আসলে লোকে জন্ম থেকেই ভারি লোভী...'

'লোকে কী ওসব কথা এখন রাখ। বরং সুজির প্যানটা এখানে নিয়ে আয়, এখানেই জল ঢেলে নিয়ে যাব, বার বার আসা-যাওয়া করতে হবে না।'

মিশকা প্যানটা এনে রেখেছিল কুয়োর পাড়ে। আমি লক্ষ করি নি। কনুইয়ে ধাক্কা লেগে প্রায় কুয়োয় পড়ে যাচ্ছিল আর কি। বললাম:

'একেবারে হাঁদা! প্যানটা আমার কনুইয়ের নিচে গুঁজে দিয়েছিস কেন? হাতে ধরে রাখ। আর কুয়োর কাছ থেকে সরে যা, নয়ত তোর পরিজও যাবে কুয়োর তলে।'

মিশকা প্যানটা নিয়ে সরে গেল। জল তুলতে লাগলাম আমি।

বাড়ি ফেরা গেল। পরিজ একেবারে ঠাণ্ডা, উনুন নেভা। ফের আমরা উনুন জেবলে পরিজ রাঁধতে বসলাম। শেষ পর্যন্ত ফুটল জিনিসটা, ঘন হয়ে উঠল, ফোঁসফোঁস করতে লাগল।

'আহ্!' বললে মিশকা, 'খাশা রান্না হয়েছে, চমৎকার!'

আমি একটা চামচ নিয়ে চেখে দেখলাম:

'থুঃ, থুঃ! এই তোর পরিজ! তেতো, নুন নেই, পোড়া-পোড়া গন্ধ।'

মিশকাও চেখে দেখে থুতু ফেললে। বললে:

'মরব তাও স্বীকার, কিন্তু এ পরিজ খেতে পারব না।'

'মরতে চাইলে বরং এই পরিজটাই খেয়ে দেখতে পারিস।'

'কী করি এখন?'

'জানি না।'

মিশকা বললে, 'হাঁদারাম, চুনোপুঁটিগুলো তো রয়েছে!'

বললাম, 'থাক তোর চুনোপুঁটি, ওই দেখ, আকাশ ফরসা হয়ে আসছে।'

'রান্না করব না, ভেজে নেব। চটপট হয়ে যাবে। চাপাতে না চাপাতেই তৈরি।'

'চটপট হলে লাগা,' বললাম আমি, 'আর পরিজের মতো হলে দরকার নেই।'

'দেখে নে তুই, এক মিনিট।'

মিশকা মাছগুলোর আঁশ ছাড়িয়ে চাপালে কড়ায়। গরম হয়ে উঠল কড়াই, মাছগুলো সব সেঁটে গেল কড়াইয়ের সঙ্গে। মিশকা একটা ছুরি দিয়ে চাঁছতে লাগল।

বললাম, 'বড়ো বুদ্ধি! বিনা তেলে মাছ ভাজে কেউ?'

মিশকা তেলের শিশিটা নিয়ে তেল ঢাললে। তারপর চটপট হবে বলে সবটাই ঢুকিয়ে দিলে চুল্লির জ্বলন্ত কাঠগুলোর উপর। তেল শোঁ শোঁ করে গরম হতে হতে হঠাৎ আগুন ধরে উঠল। মিশকা কোনো রকমে বার করে আনলে কড়াইটা, তেল তখন জ্বলছে। ভেবেছিলাম জল ঢালব, কিন্তু সারা বাড়িতে এক ফোঁটা জল নেই। ফলে শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত পুড়তেই থাকল তেল। ঘরময় ধোঁয়া, মাছ বলতে পড়ে রইল শুধু কিছু অঙ্গার।

মিশকা বললে, 'তাহলে এবার কী ভাজব বল তো?'

বললাম, 'না, আর তোকে কিছু ভাজতে দিচ্ছি না। রান্নার জিনিসপত্র নষ্ট তো করবিই, ঘরে পর্যন্ত আগুন ধরিয়ে দিবি। খুব হয়েছে!'

'কিন্তু উপায় কী? খেতে তো হবে!'

কাঁচা সুজি চিবিয়ে দেখলাম, অসহ্য। পেঁয়াজ খেয়ে দেখলাম, বড্ডো ঝাঁজ। বিনা রুটিতে মাখন গেলার চেষ্টা করলাম, গলা দিয়ে নামে না। এক বয়াম জ্যাম পাওয়া গেল। তাই চেটেপুটে খেয়ে শুতে গেলাম। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।

সকালে উঠলাম একপেট খিদে নিয়ে, মিশকা সোজা গেল সুজির টিনের কাছে, পরিজ রাঁধবে। দেখেই তো আমার একেবারে কাঁপুনি ধরে গেল। বললাম:

'খবরদার! এক্ষুণি চল্ বাড়িউলি নাতাশা মাসির কাছে, বলব পরিজ রেঁধে দিতে।'

গেলাম দুজনে নাতাশা মাসির কাছে, সব ঘটনাটা বললাম, কথা দিলাম আমরা দুজনে তাঁর সবজি খেতের সমস্ত আগাছা তুলে দেব, শুধু দয়া করে তিনি আমাদের পরিজ রেঁধে দিন। মাসির মায়া হল আমাদের ওপর: দুধ খাওয়ালেন আমাদের, বাঁধাকপির পুর দেওয়া পিঠে দিলেন, তারপর ডাকলেন প্রাতরাশে। আমরা এমনই খেতে লাগলাম যে নাতাশা মাসির ছেলে ভব্কা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর নাতাশা মাসির কাছ থেকে একটা দড়ি চেয়ে নিলাম আমরা, গেলাম কুয়ো থেকে বালতি আর কেটলি তুলতে। ভাগ্যিস মিশকা বুদ্ধি করে দড়ির সঙ্গে একটা ঘোড়ার খুরের নালও বেঁধে নিয়েছিল। তা নইলে দড়িটায় কিছু ফল হত না। নালটা কিন্তু আঙটার মতো বালতি, কেটলি দুটোকেই টেনে তুললে, কিছুই খোয়া গেল না। তারপর আমি, মিশকা আর ভব্‌কা সবাই মিলে আগাছা তুলতে লাগলাম।

মিশকা বললে:

'আগাছা, এ আর কী! কিস্যু না। পরিজ রাঁধার চেয়ে ঢের সোজা।'

ভিক্তর গোলিয়ভ্‌কিন
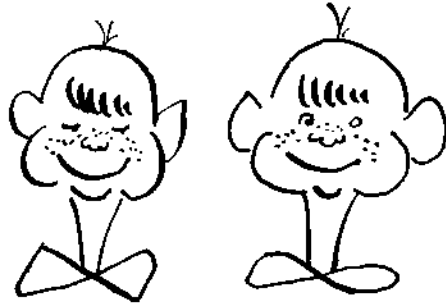
যখন ছোট

যখন যেটা

অঙ্ক কষা ফেলে রেখেই ছুটলাম বাগানে ছেলেগুলোর কাছে। ছুটছি, দেখি সামনে মাস্টার মশাই।

বললেন, 'কী খবর? বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিস?'

'না, এমনি আর কি, বাগানে যাচ্ছি।'

ও'র পাশাপাশি চলেছি আর ভাবছি, এই বার নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবেন অঙ্কটার কথা, কী বলব? এখনো তো কষা হয় নি।

উনি কিন্তু বললেন:

'দিব্যি আবহাওয়া...'

বললাম, 'হ্যাঁ, দিনটা ভালোই,' আর মনে মনে ভয়: হঠাৎ যদি অঙ্কটার কথা তোলেন।

বললেন, 'নাকটা যে তোর লাল হয়ে গেছে।' বলে হাসলেন।

'নাক আমার অমনি, চিরকালই লাল।'

'তাহলে লাল নাক নিয়েই দিন কাটাবি?'

ভয় পেয়ে গেলাম:

'কিন্তু কী করব?'

'বিক্রি করে দিয়ে নতুন একটা নাক কিনে নে।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন।'

আবার হাসলেন উনি।

আমি কিন্তু ভাবছি কখন অঙ্কের কথাটা ওঠাবেন। কিন্তু না, অঙ্কের কথা জিজ্ঞাসাই করলেন না। ভুলে গেছেন নিশ্চয়।

পরের দিন ডেকে পাঠালেন:

'কই, দেখি কী কষেছিস।'

ভোলেন নি তাহলে।

ডেস্কের নিচে

মাস্টার মশাই বোর্ডের দিকে ফিরতেই আমিও টুক করে ডেস্কের নিচে। যখন দেখবেন আমি নেই, তখন নিশ্চয় ভয়ঙ্কর অবাক হয়ে যাবেন।

সত্যি, কী ভাববেন তখন? সবাইকে জিজ্ঞেস করবেন কোথায় আমি—ওহ্, কী হাসির ব্যাপারই না হবে! কিন্তু আধ ঘণ্টা কেটে গেল, ডেস্কের নিচে সেই বসে আছি তো আছিই। কখন্ ও'র চোখে পড়বে যে আমি নেই? এ দিকে ডেস্কের নিচে বসে থাকাও সহজ নয়।

দ্যাখো না চেষ্টা করে। পিঠ টন টন করছে। কাসলাম একবার, কিন্তু কেউ নজরই দিল না। না, আর পারি না। সোরিওজা-টা আবার কেবলই পা দিয়ে গঁুতিয়ে চলেছে। সত্যিই পারলাম না। ক্লাস শেষ হবার আগেই উঠে পড়লাম। বললাম:

'মাপ করবেন পিওতর পেত্রভিচ...'

মাস্টার মশাই বললেন:

'কেন, কী ব্যাপার? বোর্ডে আসতে চাস?'

'না, মাপ করবেন, মানে, আমি ডেস্কের নিচে বসেছিলাম...'

'তা কেমন লাগল সেখানে? আরামে বসা যায় বুঝি? আজ দেখলাম তুই এতটুকু গোলমাল করিস নি ক্লাসে। বরাবর এমনি চুপচাপ থাকলে মন্দ হবে না।'

ঠিক কথা

'আবার তুই ক্লাসের মধ্যে খাবার খাচ্ছিস?'

ভালিয়া চট করে তার জলখাবারের মোড়কটা লুকিয়ে ফেলল।

'সবাই যদি এমনি ক্লাসের মধ্যে খেতে শুরু করে কী হবে?' জিজ্ঞেস করলেন মাস্টার মশাই।

অমনি গুনগুন করে উঠল সারা ক্লাস। কেননা তখন কী যে হবে সেটা বলতে চায় সবাই।

কলিয়া বললে:

'খুব রগড় হবে।'

মিশা বললে:

'কচ্‌কচ্‌ শব্দ হবে!'

মাশা বললে:

'সবারই পেট ভরে যাবে।'

'আর, কী হবে না?' জিজ্ঞেস করলেন মাস্টার মশাই।

সারা ক্লাশ চুপ করে গেল। কী হবে না, তা কেউ জানে না।

মাস্টার মশাই ভেবেছিলেন নিজেই জবাব দেবেন, এমন সময় কে চেঁচিয়ে উঠল:

'পড়া হবে না!'

'ঠিক কথা,' বললেন মাস্টার মশাই।

উল-বুনিয়ে

নিশ্চয় তোমাদের অবাক লাগবে। কেননা আমি যে ব্যাটা ছেলে... কিন্তু সেটা কিছু নয়। ব্যাপার হল আমি উল বুনতে পারি। দিদিমার কাছে শিখেছি। স্কেটিঙের টুপিটা আমি নিজেই বুনেছি।

অথচ সবাই টিটকারি দিতে লাগল আমায়: 'ছো, ছো, মেয়ে তুই! উল বোনে কেবল মেয়েরা! ছেলেরা বোনে না! দুয়ো! দুয়ো!..'

খুব কষ্ট হল। এমন টিটকারি দিলে কষ্ট আবার হয় না? এমন কি মিথ্যে কথাই বললাম। বললাম, বুনতে জানি না। প্রায় কেঁদে ফেলি আর কি। কিন্তু শুরিক যে আমায় বুনতে দেখেছে। আমাদের বাড়িতে এসেছিল, তখন দেখেছে। ও বললে, 'মিথ্যে কথা, আমি দেখেছি।'

আমার নাম দিলে ওরা উল-বুনিয়ে।

'এই যে উল-বুনিয়ে... ওহে উল-বুনিয়ে... উল-বুনিয়ে এসে গেছে রে!'

ভেবে দ্যাখো কী ভীষণ ব্যাপার!

আমি কিন্তু উল-বোনা ছাড়লাম না। টিটকারি যখন দিচ্ছে তখন বুনেই যাই। দিদিমাও বললেন:

'বুনে যা।'

নিজের জন্যে একটা সোয়েটার বুনলাম আমি, হলদে রঙ, ডোরাকাটা। ডোরাগুলো সবুজ রঙের ভারি সুন্দর। দিদিমা অবিশ্যি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তবে মোটের ওপর বুনেছি আমিই।

সোয়েটার প'রে ক্লাসে এলাম।

সবাই দেখলে সোয়েটারটা। টিটকারি দিলে না কিন্তু। কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

তারপর হঠাৎ শুরিক বলে উঠল:

'হ্যাঁ, এটা সোয়েটার বটে!'

মিশকাও:

'সোয়েটারের মতো সোয়েটার!'

আমি আর পারলাম না, বলে দিলাম:

'নিজে বুনেছি!'

'বটে?' অবাক হয়ে গেল সবাই।

বললাম, 'তা বুনতে আমি জানি।'

সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সোয়েটারটা। বুঝতে পারছি ভালো লেগেছে।

কেউ, টিটকারি দিলে না। টিটকারি দেবার কী আছে। বুনতে জানা মোটেই খারাপ কিছু নয়। সবাই বুঝেছে সেটা।

সিন্দুকে কুমড়ো

আমার কুমড়োটা দেখেছ? দেখো নি? নিজেই ফলিয়েছি। আর কোথাও নয়, আমাদেরই ঝুলবারান্দায়, দিদিমার পুরনো সিন্দুকটায়।

মাটি বোঝাই করলাম সিন্দুকে। ডালাটা খুলে নিলাম। বীজ পুঁতলাম। বেড়ে উঠল গাছ, তারপর কুমড়ো। বাড়িতে যারা আসে তাদের দেখাই। অবাক হয়ে যায় সবাই। বলে ঠাট্টা নয়, সিন্দুকে কুমড়ো। প্রদর্শনীতে পাঠানো উচিত মস্কোয়। দেখুক কেমন কুমড়ো হয় আমাদের জেলায়!

ওটাকে নিয়ে ভারি গর্ব ছিল আমার। চোখ আর ফেরাতে পারতাম না। মাকে ডেকে বলতাম:

'দ্যাখো মা, কেমন বেড়ে উঠেছে। কাল কত ছোটো ছিল, দেখেছো?'

মনে হত যেন এক রাতের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে। কখনো আবার সন্দেহ হত একটু যেন ছোটো হয়ে গেছে। অবিশ্যি জানি, তা তো আর হতে পারে না।

কেবলি ভাবতাম প্রদর্শনীর কথা। নিয়ে যাব প্রদর্শনীতে, বলব আমিই ফলিয়েছি, সিন্দুকে। সবাই বলবে কী চমৎকার! সত্যিই সিন্দুকে ফলেছে? এমন কুমড়ো আমাদের এখানে কখনো আসে নি। দাও তোমার কুমড়ো। নিয়ে তাকের ওপর রাখবে, একটা ফলক আঁটবে। ফলকে লেখা থাকবে, 'সিন্দুকী কুমড়ো' কেননা সিন্দুকে ফলেছে। তার পাশে আমার নাম, কেননা আমি ওটা ফলিয়েছি। হয়ত প্রাইজও পেয়ে যেতে পারি।

কেবলি কুমড়োর কথা ভাবতাম। কেবলই জল দিতাম তাতে। কেবলি মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করতাম, আর কী কী করতে হবে। তবে বাবা কিন্তু কুমড়োর কথা সইতে পারতেন না। বলতেন:

'জ্বালালে তোমাদের কুমড়োয়। একেবারে পাগল করে দেবে। সারা দিন কেবল ঐ এক কথা। কাজ থেকে ফিরেছি, একটু জিরব, পড়ব... তা না, এসে কুমড়ো নিয়ে পড়েছে... আমায় একটু রেহাই দাও তো বাপু!'

নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন বাবা।

সবারই কাছে বলতাম কুমড়োটার কথা। কুমড়োর কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়তাম। জাগতামও কুমড়োর কথা ভেবেই। সিন্দুক আর কুমড়োর স্বপ্ন দেখতাম।

ব্যাপারটা চুকিয়ে দিলে পাড়ার ছেলে আল্‌কা।

বললে, 'কী এটা? কুমড়ো?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই। তুই কী ভেবেছিলি?'

'ভেবেছিলাম বাদাম।'

'বাদাম মানে?' চটে উঠলাম আমি।

'একে আবার কুমড়ো বলে নাকি?' ও আমায় নিয়ে গেল স্কুলের ছেলেদের চষা সবজি ক্ষেতটায়। গিয়ে দেখি, হ্যাঁ কুমড়ো বটে! একেবারে প্রকান্ড প্রকান্ড। গন্ডা গন্ডা।

'নিজেরাই আমরা ফলিয়েছি,' বললে আল্‌কা।

নিজের ফলানো কুমড়োটার জন্যে লজ্জা হচ্ছিল। তাহলেও বললাম:

'কিন্তু আমার কুমড়ো সিন্দুকে ফলানো।'

পাখি

ঘণ্টা পড়তেই বেরিয়ে এলাম স্কুলের আঙিনায়। চমৎকার দিন। ঝড় নেই। বৃষ্টি নেই। বরফ নেই। কেবল ঝলমলে রোদ।

হঠাৎ দেখি বেড়াল ওঁৎ পাতছে। ভাবলাম, কোথায় ওঁৎ পাতছে বেড়ালটা দেখি তো। চুপি চুপি পেছু নিলাম বেড়ালটার। হঠাৎ লাফ দিলে বেড়ালটা। দেখি কি, দাঁতে তার একটা পাখি—চড়ুইছানা। বেড়ালটার লেজ টেনে ধরলাম:

'দে এক্ষুণি, দে বলছি পাখিটা।'

পাখিটা ফেলে দিয়ে পালাল বেড়াল।

ক্লাসে নিয়ে এলাম পাখিটাকে।

লেজের খানিকটা ছিঁড়ে গেছে।

সবাই ঘিরে ধরল আমায়, চ্যাঁচাতে লাগল:

'আরে দ্যাখ দ্যাখ, পাখি! জ্যান্ত পাখি!'

মাস্টার মশাই বললেন:

'বেড়ালে পাখি ধরে গলায় কামড়ে। তোর পাখিটার ভাগ্যি ভালো। কেবল লেজের ওপর দিয়ে গেছে।'

সবাই পাখিটাকে একটু ধরে দেখতে চায়। কিন্তু কাউকে দিলাম না আমি। ওটা পাখিরা পছন্দ করে না।

পাখিটাকে গিয়ে রাখলাম জানলার বাজুতে। ঘুরতেই দেখি, পাখি আর নেই। 'ওরে ধর, ধর' বলে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেরা। পাখি কিন্তু উড়েই গেল।

তবে আমার কোনো দুঃখু হল না। আমিই যে ওকে বাঁচিয়েছি। সেইটেই তো বড়ো কথা।

বিউগ্‌ল

ভেবেছিলাম বিউগ্‌ল বাজানো এমন কিছু নয়। ফুঁ দিলেই বেজে উঠবে। দেখা গেল ব্যাপারটা মোটেই তেমন নয়।

একদিন আমাদের পাইওনিয়র শিবিরের বিউগ্‌লবাদক নদীতে চান করতে গেছে, আমি আর ভব্‌কা তার বিউগ্‌লটা নিয়ে ভাবলাম গোটা কয়েক গৎ বাজাব, তারপর রেখে দেব যেখানে ছিল।

ভব্‌কা বললে:

'কী বাজাব বল্।'

বললাম, 'বাসন্তী হাওয়ার গানটা বাজা।'

বললে, 'বেশ, সুরজ্ঞান আমার একটু আছে।'

ভব্‌কা বিউগ্‌লটা ওপরে তুলে গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিতে লাগল। কিন্তু আওয়াজ বেরুল না।

বললাম, 'বোধ হয় তোর ফুঁ তেমন জোরালো হচ্ছে না।'

'নারে, প্রাণপণে ফুঁ দিচ্ছি,' বলে এমন ভাবে ফুঁ দিতে লাগল যে মনে হল বুঝি ফেটে যাবে। কানদুটো পর্যন্ত তার লাল হয়ে উঠল।

বললাম, 'আচ্ছা, আমায় দে তো।'

আমিও ফুঁ দিয়েই গেলাম, শব্দ নেই।

'তুই ঠিকই বলেছিস, এটাতে আওয়াজ নেই।'

'হয়ত ঠিকভাবে ফুঁ দিতে পারছি না?'

'ফুঁ দেবার আবার ঠিক-বেঠিক কী আছে?'

পালা করে আরো একবার চেষ্টা করলাম আমরা। কিছুই হল না। আওয়াজ বেরুল না শিঙ্গায়।

এই সময় কাছ দিয়ে যাচ্ছিল মিশা জিয়াবলিকভ। ওকে ফ‍ঃ দিতে দিলাম। বলা যায় না, হয়ত ও পারবে।

ফ‍ঃ দিল মিশা—তাতেও আওয়াজ নেই।

তারপর আরও অনেকে জুটেছিল। সবাই ফ‍ঃ দিলে পালা করে। ফল হল না কিছুই।

হঠাৎ কলিয়ার বেলায় ঝন্‌ করে একটু আওয়াজ বেরিয়ে এল। অল্প হলেও আওয়াজ তো। সোরগোল করে উঠলাম আমরা।

'কী করে হল রে? কী করে হল, বল তো?'

কলিয়া কিন্তু নিজেই জানে না কী করে হল। বললে, 'ফ‍ঃ দিচ্ছি, দিচ্ছি, দিচ্ছি, হঠাৎ ভোঁ করে উঠল।'

তারপর অনেক বার চেষ্টা করলে সে, কিন্তু আওয়াজ আর হল না। যথাস্থানে রেখে দিতে হল বিউগ্‌লটাকে। বোঝাই যায় যন্ত্রটা খারাপ।

সন্ধ্যেয় হঠাৎ শুনি আওয়াজ। পাইওনিয়র শিবিরের ওপর দিয়ে সুরের ঢেউ উঠেছে।

বাজাচ্ছে আমাদের বিউগ্‌লবাদক লেভা।

আশ্চর্য বাজনা!..
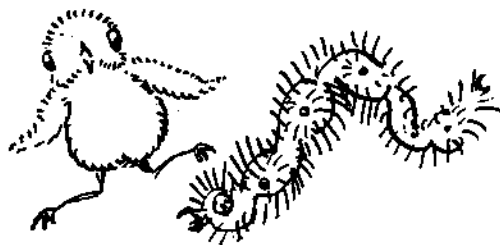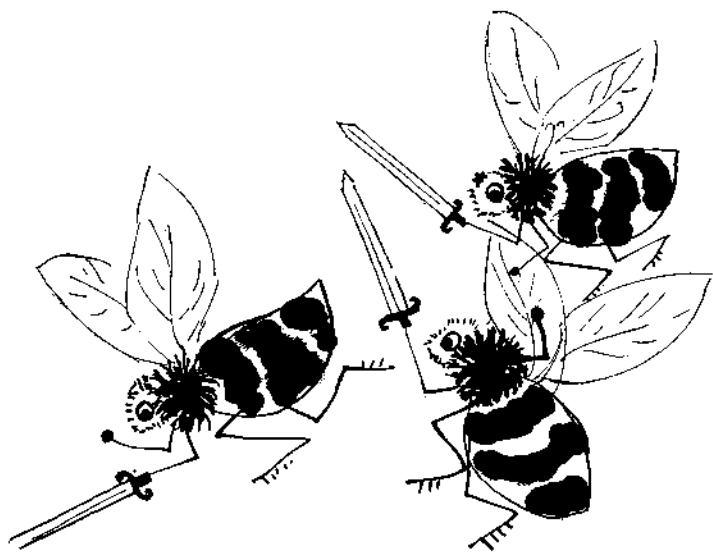
মা একদিন বাবাকে বললেন, 'হ্যাঁগা, মৌমাছি পাললে হয় না? পাড়ার সবাই পালে। ঘরের মধু খায়।'

'ঠিক আছে, পালা যাবে,' বললেন বাবা।

রবিবার বাজার থেকে উনি দুটি মৌমাছি পালনের খাঁচা নিয়ে এলেন।

প্রায়ই দেখতাম, বাবা এসে খাঁচার ডালাটা খুলতেন, চাকটা বার করে আনতেন সেখান থেকে, তারপর মা সেখান থেকে ঘন মধু ঢালতেন সোনালী রঙের। প্রথম প্রথম বাবা ডালা খোলার আগে মাথায় কাপড় জড়িয়ে নিতেন। পরে খালি মাথাতেই খুলতেন। মৌমাছির কামড়ের কথা কখনো বলেন নি।

একদিন মা-বাবা গেছেন কী একটা বিয়ের ভোজে। একা একা আমার বিছছিরি লাগছিল, ডেকে আনলাম আহমেদকে। মৌমাছির আলাপটা ঠিক কী থেকে উঠেছিল মনে নেই। তবে আমি বড়াই করে বলেছিলাম:

'জানিস, আজকাল আমরা ঘরের মধু খাই। এখনো চাকভর্তি মধু।'

'যাঃ!' বিশ্বাস করল না আহমেদ।

'মৌমাছিরা ভারি পরিশ্রমী যে। কেবলি মধু জোগাড় করে,' বুঝিয়ে বললাম ওকে।

'খেতে কী দিস ওদের?'

'কিছুই না। নিজেরাই খাওয়া জোটায়। উড়ে যায় অনেক দূর বনের মধ্যে, সেখানে খায়। তারপর ফুল থেকে মধু তুলে এখানে নিয়ে আসে। খাবি মধু? খাওয়াতে পারি তোকে। মৌমাছিরা আমায় কামড়ায় না,' গর্ব করে জানিয়ে দিলাম। 'বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'যা না, কেমন না কামড়ায় দেখবি,' টিটকারি দিলে আহমেদ।

খাঁচার কাছে গেলাম আমরা। সেগুলো থাকত আমাদের বাগানে। কাছে এসে উঁকি দিলাম। সব চুপচাপ, শান্ত। ছোটো ছোটো ফুটোগুলো দিয়ে আপনমনে কেউ ঢুকছে, কেউ বেরুচ্ছে। কোথায় যেন উড়ে যাচ্ছে।

বললাম, 'দাঁড়া-না, এক্ষুণি ডালাটা খুলছি, দেখবি আমাদের মধু কেমন মিষ্টি।'

'না রে, ভয় করছে,' বললে আহমেদ, 'তার চেয়ে বরং মাথায় কিছু একটা জড়িয়ে নিই, তোর বাবা যা করে।'

'ধুৎ, বলছি যে ওরা কামড়ায় না। বাবাও এখন আর কিছু জড়ান না। ভয় করছে তোর? আমার কোনো ভয় নেই।'

কাজে নামলাম আমি। আহমেদ দূরে সরে গেল। খাঁচার ডালাটা খুললাম, বাবা যেমন করে, চাকের ওপর দিকটা ধরে ভেঙ্গে নেব ঠিক করলাম। আহমেদ তখন কাছে এসে উঁকি দিলে খাঁচায়। কিন্তু চাকের খানিকটা ভাঙতে না ভাঙতেই খাঁচার ভেতরে কী একটা যেন পড়ে গেল। এমন বন্‌বন্‌ করে উঠল যেন এরোপ্লেন উড়ছে। দড়াম করে ডালাটা বন্ধ করে

ছুটলাম। কিন্তু হাজার হাজার মৌমাছি ততক্ষণে কালো মেঘের মতো ঝাঁক বেঁধেছে মাথার ওপর। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ছুট দিলাম। কানে আসছে, অমানুষিক স্বরে চিৎকার করছে আহমেদ।

ছুটে এলাম ঘরে, পেছু পেছু আহমেদ। ক্ষেপার মতো কখনো ঘাড় ঢাকছে, কখনো মুখ...

আমার কপাল এমন টনটন করতে লাগল যে অসহ্য। বোধ হয় আধঘণ্টাখানেক চিৎকার করে ঘরময় ছোটাছুটি করেছিলাম আমরা। কিন্তু আমার মনে হল আহমেদ যেন আমার চেয়েও বেশি ককাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত ও শুধালে:

'খুব টাটাচ্ছে তোর?'

বললাম, 'টাটাবে না আবার! আর তোর?'

'আমারও,' কাঁদতে কাঁদতে বললে ও, 'জ্বলে যাচ্ছে।'

'আমার জ্বলছে না, টনটন করছে।'

'আয় কাদা মাখি, তাহলে কমে যাবে,' হঠাৎ প্রস্তাব দিল ও।

'কাদা? সে আবার কী?'

'আরে হ্যাঁ, আমি জানি। কাদা লেপে দিতে হয়। মাঠে মা-কে যখন বোলতায় কামড়ায়, তখন মাও তাই করেছিল।'

মুখে আমরা কাদা মাখলাম, কিন্তু ব্যথা কমল না। বসে বসে কখনো কপাল কখনো ঘাড় চেপে ধরি। আহমেদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। নাকটা ওর এমন ফুলেছে যে চেনা যায় না।

বললাম, 'তোর নাকটা যে একেবারে গোল আলু হয়ে উঠেছে।'

'নিজেই তুই একটা আলু। তোর দোষেই তো হল, আর এখন কিনা হাসছে। দেখ তো কী হয়েছে,' আমার দিকে নাকটা বাড়িয়ে সে বললে।

কিন্তু নাকে ওর কী হয়েছে সেটা ভালোই বোঝা গেল। আমার নিজের কপালটাই ঠিক ভুরুর ওপর এমন ফুলে উঠেছে যে কেবল এক চোখে দেখতে হচ্ছিল।

'আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। নিশ্চয় কানা হয়ে যাব,' ভয় পেয়ে বললাম আমি, 'কী করি এখন।'

'তোর আর ভাবনা কী, এক চোখেও লোকে দেখতে পায়,' নিজের নাক চেপে ধরে সান্ত্বনা দিলে আহমেদ। 'শুধু তোকে দেখতে হয়েছে খানিকটা ডাইনির মতো। কিন্তু আমার নাকটা যা হয়েছে, নিঃশ্বাসই নিতে পারছি না। কী করি?'

কিন্তু যন্ত্রণাটাই সব নয়। বড়ো কথা হল মা-বাবাকে কী বলব?

'আমাদের কীর্তি যদি জানে, তাহলে আরও দুঃখু আছে। একটা উপায় বার করতে হয়।'

'কী করে?' জিজ্ঞেস করলে আহমেদ।

'শোন, বলব যে আমরা মারামারি করেছি, তারপর এখন আবার ভাব হয়ে গেছে। ঠিক বিশ্বাস করবে, এরকম তো কতবারই হয়েছে...'

'ঠিক আছে,' সায় দিলে আহমেদ।

ও চলে যেতে চাইছিল, বহু কষ্টে ওকে থাকতে রাজী করালাম। দুজন থাকলে কৈফিয়ৎ দেওয়া তবু খানিকটা সোজা।

কিছু বাদেই মা এলেন। আমরা বসেছিলাম অলিন্দে। দু'জনেই আমরা আমাদের ব্যথার জায়গাটা চেপে ধরেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমার ফোলা চোখটা মা'র নজরে পড়ল। পরে চোখে পড়ল আহমেদের নাকটা।

'কী হয়েছে তোদের?' জিজ্ঞেস করলেন মা।

'কিচ্ছু না, এই একটু মারপিট করেছিলাম আর কি,' জবাব দিলাম আমি। 'একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে। আমি ঘুসি মারি ওর নাকে, ও আমার চোখে। কেন জানি সঙ্গে সঙ্গেই ফুলে উঠল।'

অবিশ্বাসের চোখে মা চাইলেন আমার দিকে।

'বাজে, ব্যাপারটা কী শুনি?'

'ও এই আর কি,' সঙ্গে সঙ্গেই বানাতে হল আমায়, 'মানে আমি বলছিলাম মৌমাছিরা জীব নয়, পাখি, কেননা ওড়ে। ও বলছিল, না, জীব। বাস্ ঝগড়া বেধে গেল।' এই সব কথা মাকে বলছি বটে, কিন্তু বুক ঢিপ ঢিপ করছে, যদি ধরে ফেলে। 'বিশ্বাস না হয়, বেশ, আহমেদকে জিজ্ঞেস করো।'

'উ'হু, কেমন কেমন যেন লাগছে। আয় তো দেখি।' বলে মা আমার চোখ দেখতে লাগলেন, 'মিছে কথা। নিশ্চয় মৌমাছির কামড়। মৌচাকে হাত দিয়েছিলি নিশ্চয়? কবুল কর্।'

কী আর করা যায় তখন। বললাম:

'কী করে জানলে বলো তো? তবে, আমরা হাত দিই নি, শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৌমাছির ওড়া দেখছিলাম। হঠাৎ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল একেবারে জানোয়ারের মতো... আচ্ছা, বাবাকে কেন কামড়ায় না, আর আমাদের কামড়াল?'

'কামড়েছে, ঠিকই করেছে। কেন ওদের পেছনে লেগেছিলে?' বললেন, 'বাবাকে কামড়ায় না কারণ তাঁকে চেনে, অভ্যেস হয়ে গেছে। খুব বুদ্ধিমান পতঙ্গ ওরা।'

'আচ্ছা, অতই যদি বুদ্ধিমান, তাহলে আমার সঙ্গেও চেনাজানা হয়ে যেতে পারে?'

'অতশত জানি না। বাবা এলে জিজ্ঞেস কর।'

বাবার কাছে আমি অবিশ্যি কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না। ভয় হল, হঠাৎ যদি খাঁচার কাছে গিয়ে ভাঙা মৌচাকটা দেখেন, তখন দফা শেষ! এখনও তিনি কিছু জানেন না। আমার এদিকে এমন ইচ্ছে হচ্ছে, গিয়ে বলি মৌমাছির সঙ্গে কী ভাবে চলতে হয় সেটা আমায় শিখিয়ে দিন।

একটা শুধু সন্দেহ আছে আমার, মৌমাছিকে বশ করা কি অত সহজ হবে — বড্ড বেশি বনবনিয়ে কামড়ায়। হয়ত আসলে ওরা জীবও নয়, পাখিও নয়, খাঁটি জানোয়ার।

খালিদা সালিলাতা
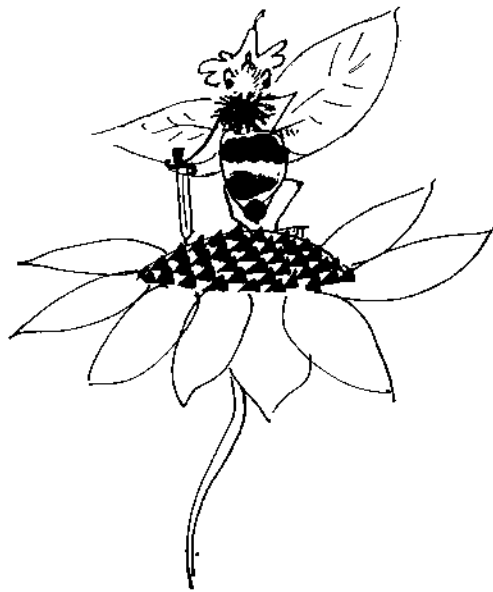
সাগরের প্রজাপতি
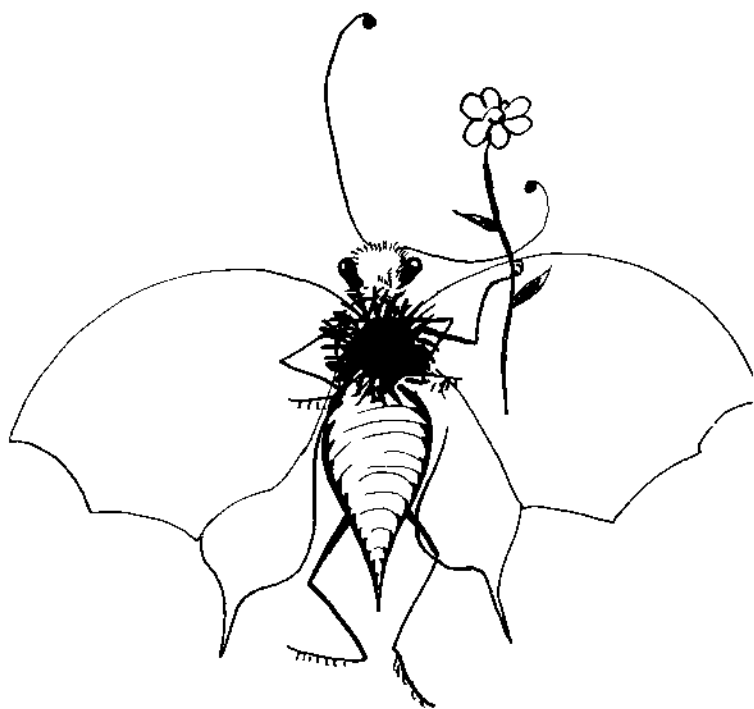
দাদুর জন্যে পথ চেয়ে আছে উল্‌দুজ। দাদু কাজ করেন সামুদ্রিক পেট্রল খনিতে। আজ তাঁর ঘরে ফেরার কথা। কিন্তু তুফান উঠেছে। লোকে বলে এরকম দিনে সাগরে ঢেউ ওঠে তিন তলা বাড়ির সমান উঁচু, বাতাসের ঠাণ্ডা ঝাপট তরোয়ালের মতো শনশনে, মেঘে ছেয়ে আসমান এমন জমাট যে চোখে কিছু দেখা যায় না।

উল্‌দুজ দাদুর কাছে শুনেছে যে লোকে সাগরের বুকে মস্তো এক শহর তুলেছে। রাস্তাগুলো তার ভারি লম্বা লম্বা। দুধারে তার বড়ো বড়ো উঁচু বাড়ি। তারই একটা বাড়িতে থাকেন দাদু। এক হপ্তা থাকেন সেখানে, তেল তোলার ডেরিকে যতক্ষণ কাজ চলে, তারপর ফিরে আসেন বাড়িতে। ক'দিন জিরিয়ে আবার চলে যান তাঁর সাগরের শহরে। সত্যি বলতে কি, সাগরের বুকে আসল একটা শহর উঠেছে এটা উল্‌দুজ ঠিক বিশ্বাস করে নি। দাদু হয়ত স্রেফ গল্পের মতো বানিয়ে বানিয়ে বলেছে, ভাবত সে। জিজ্ঞেস করত:

'দাদু, তোমাদের ও শহরে সিনেমা আছে?'

'আছে রে,' বলতেন দাদু।

'দোকান?'

'দোকানও আছে!'

'লাইব্রেরি?'

'তাও আছে।'

'মোটর-গাড়ি?'

'আছে বৈকি। মোটর, লরি অনেক আছে।'

'চিড়িয়াখানাও আছে?'

দাদু হেসে মাথা দোলান:

'যা নেই, তা নেই। চিড়িয়াখানা এখনো হয় নি। তবে পাখি আছে, অনেক পাখি। আর কী তুই জানতে চাস বল্।'

উল্‌দুজ ভাবতে লাগল আর কী জিজ্ঞেস করা যায়। বললে:

'আর ফুল আছে তোমাদের শহরে?'

'আছে বৈকি। ফুল না থাকলে আবার শহর! যদি চাস, তোর জন্যে একটা তোড়া এনে দেব।'

'খুব ভালো হবে দাদু, এনে দিয়ো কিন্তু।'

এখন অধীর হয়ে দাদুর পথ চেয়ে আছে উল্‌দুজ। ঝড় ওদিকে যেন ইচ্ছে করেই বাড়ছে। দিদিমা আঙিনার এদিক-ওদিক দেখে ঘরে ফিরে মাথা ঝাঁকালেন:

'উঁহু, দাদু তোর আজ আর আসবে না।'

ঠাণ্ডা কেটে গেল। মৃদুমন্দ গরম পড়ল। মিঠে রোদে ভরে গেল চারিদিক।

হঠাৎ দাদু এলেন, নাতনীর জন্যে নিয়ে এসেছেন লাল লাল গোলাপ।

'এবার দেখলি তো, আমাদের শহরে ফুলও ফোটে?'

ফুলদানিতে গোলাপগুলো রাখলে উল্‌দুজ। আর দিন কয়েক পরে কাজে চলে গেলেন দাদু। সমুদ্র এবার এমনই শান্ত আর স্বচ্ছ যে জলের তলে মাছের ঝাঁকও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কাঠের প্যাটাতনের রাস্তা দিয়ে দাদু যাচ্ছিলেন তাঁর তেল তোলার ডেরিকে। দু' পাশে বড়ো বড়ো কাঠের টব, তাতে রঙ-বেরঙের ফুল। তার ওপর পাক দিচ্ছে ঝলমলে প্রজাপতি। সন্ধ্যায় ফেরার সময় দাদু একটি প্রজাপতি ধরে কাচের বয়ামে পুরলেন।

'কী ওস্তাদ, প্রজাপতির দরকার পড়ল কিসে?' জিজ্ঞেস করলে সঙ্গীরা।

'নাতনীকে দেব। দেখুক আমাদের সাগরের শহরে কত সুন্দরীর মেলা।'

সৌমিত্রের শুরতারকত

'শুনছি, যাত্রা বাড়ছে...'
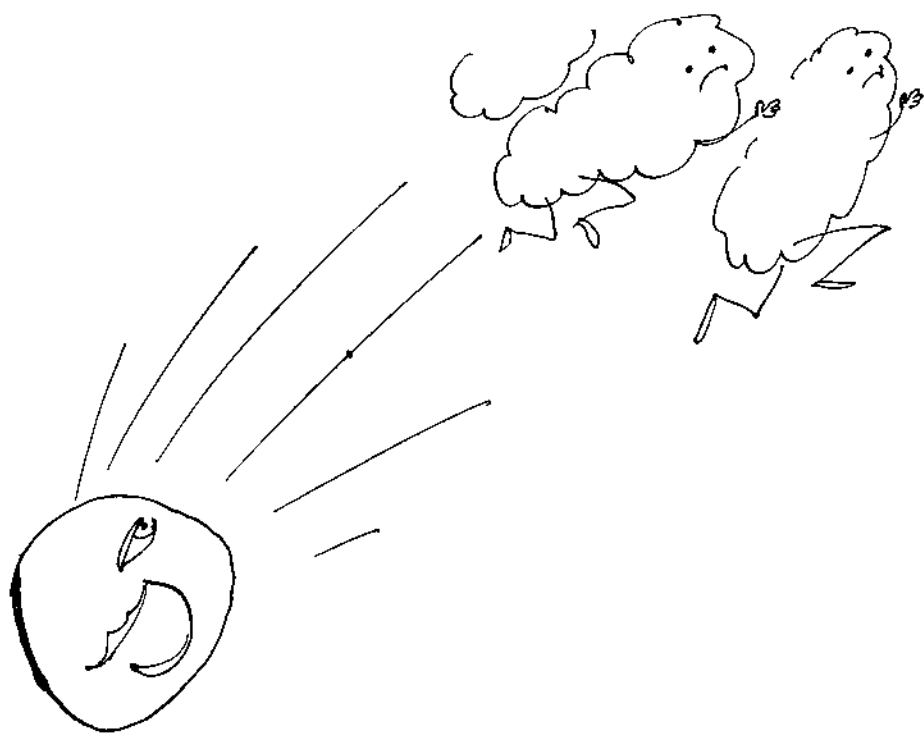
'আচ্ছা, মেঘগুলো সব গেল কোথায়?' বললে ল্যুবাশকা।

ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে সে নীল আগুনে পোড়া আকাশটাকে দেখছিল। পরিষ্কার ফাঁকা আকাশ। শুধু ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে একটা তপ্ত গোলক—সূর্য। আজ দু'দিন ধরে এই চোখ ধাঁধানো গোলকটায় মেঘের ছায়া পড়ে নি।

গুমোট। গরম। তপ্ত হাওয়ায় তালু জ্বলে যায়। পুড়ছে, পুড়ছে, ফ্যাকাশে নীল আগুনে পুড়ছে উঁচু আকাশটা। পুড়ছে একদিন, দু'দিন, সপ্তাহ, দু' সপ্তাহ। শাদা মেঘগুলো যেন দানা বাঁধতে না বাঁধতেই সে আগুনে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে।

'অমন মনমরা কেন ওগুলো, অমন চুপচাপ?' বললে খেতের গম শীষগুলোকে লক্ষ করে।

গমগাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে একেবারে নিশ্চল। গম, ঘাস, গাছপালা — সবকিছুই। এতটুকু খসখসানি নেই।

'হবে না মনমরা!' পাশ দিয়ে যাচ্ছিল শুরা মাসি, আমার হয়ে সে জবাব দিলে, 'ঘাসগুলো যে নিঃশ্বাস নিতেই পারছে না, শুকিয়ে মরবে।'

'ঘাসে আবার নিঃশ্বাস নেয় নাকি?'

'নেয় বইকি,' বললাম আমি।

ল্যুবাশকা ঘাসের ওপর কান পেতে শুনল:

'উঁহু, শুনতে পাচ্ছি না তো।'

আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, এখানে বড়ো গোলমাল: মুরগী ডাকছে, ঘেউ ঘেউ করছে কুকুর, কাঠ ফাড়ছে লোকে, এখানে কি শোনা যায়? শুনতে হলে যেতে হয় দূরে ঘাসে-ভরা মাঠে।

তবে ব্যাখ্যাটা ল্যুবাশকার মনে ধরল না। তক্ষুণি ছুটে গিয়ে বিনা গোলমালে ঘাসের নিঃশ্বাস শোনার ইচ্ছে হল তার।

ভারি এক ফ্যাশাদ বাধালে শুরা মাসি।

খেতে আরো গরম, একটু ছায়া নেই গা বাঁচাবার।

আকাশ এখানে আরো বড়ো, আরো উঁচু। শুরু হয়েছে একেবারে ওই টিলেগুলো থেকে, কোথাও আড়াল পড়ে নি। শুধু আকাশ আর মাঠ। তাছাড়া খেতের মধ্যে দিয়ে ওই হাঁটা পথটা। বাস্! ওপরে আকাশ, আর নিচে খেত আর আমরা, চলেছি হাঁটিতে হাঁটিতে।

ট্র্যাক্টরের ঘড়ঘড় শোনা গেল। খেতের ওদিক থেকে ধুলোর মেঘ উঠল। হাঁটা পথটাতেও পুরু হয়ে জমেছে ধুলো। কাছের গমগাছগুলো যেন ছাই-মাখা।

পাকন্ত গাছগুলো যেন মূর্ছা গেছে; একটা শীষও কাঁপছে না, একটা পাতাতেও সরসরানি নেই। বোবা। কালা। আধা-ঘুমে কিসের যেন হাপিত্যেশ। খরা। গুমোট।

'কী চাইছে ওরা?' ল্যুবাশকা জিজ্ঞেস করলে গমগুলোর কথা।

'বৃষ্টি চাইছে। তোর তেষ্টা পেয়েছে তো?'

'হ্যাঁ পেয়েছে।'

'দ্যাখ তবে, অথচ জল খেয়েছিস মাত্র ঘণ্টা খানেক আগে। দু'হপ্তা বৃষ্টি হয় নি, ওদেরও তেষ্টা পায় তো।'

'কিন্তু ওদের তো প্রাণ নেই!'

'আছে বইকি। ওই গমগাছগুলো, এই ঘাস, এই ফুলটা, ওই বার্চগাছটা, সবারই প্রাণ আছে। নিঃশ্বাস নেয়, মাটি থেকে রস খায়, রোদ খায়।'

'কিন্তু এখানেও নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে না কেন?' ফের জিজ্ঞেস করলে ল্যুবাশকা।

উত্তর দেবার ফুরসুত হল না। বনের ওপারে গর্জন করে উঠল যেন মস্তো এক কামান দেগেছে। খেতের ওপর দিয়ে বহু দূরে গড়িয়ে গেল বজ্রের গুরুগুরু। বনের ওপরকার আকাশটা হয়ে উঠল ঘোলাটে, আর তার ফ্যাকাশে নীলের ওপর দিয়ে হুড়মুড়িয়ে এল ঘন কালো মেঘ।

মেঘ ডাকল আরও অনেক বার। রুপোর খড়্গ দিয়ে যেন কেউ বাঁকা কোপ মেরে চলেছে। কিন্তু কাটতে পারছে না। ধীরে ধীরে কেবলই উঠে আসছে মেঘ। উঁচুতে, আরো উঁচুতে। ঢেকে ফেললে আধখানা আকাশ, ঢাকা পড়ল সূর্য। জ্বলজ্বলে রোদের জায়গায় হঠাৎ যেন গোধূলি নেমেছে। গুমোট, আগের চেয়েও যেন বেশি গুমোট।

চারিদিককার এই হঠাৎ-বদলটা চুপ করে দেখছিলাম আমরা। অন্য সবকিছুও আমাদের মতোই চুপচাপ। যেন লুকিয়ে পড়েছে, নিথর হয়ে গেছে একটা মস্তো ঘটনার সামনে।

আবার বাজ ডাকল, রুপোর বাঁকা খড়্গে ফুলে ওঠা মেঘের ওপর কোপ পড়ল আবার। এবার কিন্তু ফেটে গেল মেঘ। সেই ফাটল দিয়ে বৃষ্টি নামল ঘুঘুরঙা ধারায়। একটা বার্চগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা, হঠাৎ তার ডালপালায় দমকা হাওয়ার দোল উঠল। বৃষ্টি ঝেঁপে এল এখানেও, ঘা দিলে পাতায় পাতায়। আনন্দে থরথরিয়ে উঠল গাছটা, প্রতিটি পাতাই যেন তার জলের ফোঁটাটুকুর জন্যে অস্থির।

'যেন হাসছে!' বার্চগাছটার কথা বললে ল্যুবাশকা, 'কিসের আনন্দে? বৃষ্টির জন্যে?'

'দ্যাখ্, গমগাছগুলোও একেবারে তাজা হয়ে উঠেছে।'

বাতাসে দোল খাচ্ছে শীষ, খেতময় ঢেউ। বৃষ্টিও আসছিল ঘনঘন। এই সামনে খেতের ওপর দেখা গেল ঘুঘুরঙা বাঁকা ধারা, হঠাৎ তা ধেয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। আসছে, আসছে, এসে গেল গাছের মাথায়। ভেজা পাতায় জল আর আটকাল না, অঝোরে ঝরে পড়ল আমাদের খোলা মাথায়, কাঁধে।

মাথায় আর ভেজা মুখখানায় হাত বুলাল ল্যুবাশকা।

'আহ্ !'

'চমৎকার!'

আমি ওর হাত ধরে সোজাসুজি এগিয়ে গেলাম বৃষ্টির মধ্যে। ওম-ওম বৃষ্টি, জলে ধুয়ে যাচ্ছে রোদপোড়া মুখ, কী ভালোই না লাগছে, চারপাশের সব কিছু হয়ে উঠছে তাজা, রসালো, জ্বলজ্বলে, যেন নতুন করে জন্ম হল। আর খালি পায়ে নরম ভেজা মাটির ওপর দিয়ে, টাপুর-টুপুর জমা জলগুলোর ওপর দিয়ে হাঁটতেও আনন্দ। জোরে জোরে ছপ ছপ করতে লাগলাম আমরা, ভিজে যাবার ভয় তো আর নেই, কিছুরই ভয় নেই।

এক দুই, ছপ্, ছপ্, ছপ, ছপ!

হেসে উঠলাম আমরা, কে জানে কেন। অনেক দিন এমন খুশি লাগে নি।

'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে!'

আয় বৃষ্টি, আয়! আরো ঝেঁপে, আরো ঝেঁপে! ঢাল, কেপটামি করিস নে। মাটি আর তার গাছপালা সবার তেষ্টা মিটুক।

হঠাৎ বৃষ্টির ধারা কমে এল, ঝিমিয়ে এল। ঘেসো মাঠটায় যখন গিয়ে পেঁছিলাম, তখন একেবারেই তা থেমে গেছে। আবছা ঝিকমিক করছে মাঠটা, জলে ধোয়া ফুলগুলোর ওপর, জ্বলজ্বলে সবুজ ঘাসগুলোর ওপর হালকা ভাপ ভাসছে।

বসলাম গিয়ে মাঠটার একেবারে ধারে, ল্যুবাশকা তো আবার শুয়েই পড়লে, কান পাতলে ভেজা ঘাসের ওপর। সে তো করবেই। কারো যদি কিছু একটা জানবার ইচ্ছে হয়, সে তো তখন তাই নিয়েই দিনরাত ভাববে, সাতবার জিজ্ঞেস করবে। বোঝাই যাচ্ছে, কী করে ঘাস বাড়ে তা শোনার অসম্ভব ইচ্ছে হয়েছে ল্যুবাশকার।

জলের ভারে ডগমগ করে উঠেছে ঘাস-ফুলগুলো, নিজেদের পেয়ালা আর কলসি উপচানো বাড়তি জলটুকুও প্রাণে ধরে ছাড়তে চাইছে না। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে, ঘাস পড়ছে নুয়ে, হয়ত এক পলক রইল তার পাতার ওপর, আস্তে করে কেঁপে উঠল ঘাস। প্রায় চোখেই পড়ে না ঘাসগুলোর এই তিরতিরানি। কে জানে তার কারণ কী, হয়ত জল পেয়ে তাজা হয়ে উঠেছে শিকড়গুলো, জলের ফোঁটাগুলো শুষে নিচ্ছে, শুষছে, শুষছে, তেষ্টা আর মিটছে না।

'শুনতে পাচ্ছি!' বললে ল্যুবাশকা। বললে না, আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল।

আবছা ঝিকমিকে মাঠটার দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে ছিলাম, চট করে ধরতে পারলাম না কী ও বলছে।

'শুনছি ঘাস বাড়ছে!'

আমিও কান পাতলাম মাটিতে, সত্যিই ভারি আবছা নরম, প্রায় ধরা যায় না কী সব শব্দ। হয়ত ঘাসের ওপর জলের ফোঁটার শব্দ, হয়ত ফুলগুলোর শেকড়ে জল টানার শোঁ

শোঁ। নাকি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যিই হয়ত ল্যুবাশকা আর আমি শুনেছি বৃষ্টির পরে তাজা ঘাস কীভাবে বাড়ে!..

বৃষ্টি থেমে ছিল কেবল কিছুক্ষণ। বনের ওপার থেকে আবার এগিয়ে এল ঘুঘুরঙা বৃষ্টি ধারা, মাঠের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল সোজা আমাদের দিকে।

উঠে দাঁড়ালাম আমরা, এগিয়ে গেলাম বৃষ্টির দিকে। ফের ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল হাতের ওপর, মুখের ওপর বৃষ্টির স্নিগ্ধ ছোঁয়া নিই। আর বৃষ্টি যখন একেবারেই এসে পড়ল, তখন গেয়ে উঠলাম:

'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে!'

এখন আর মনে নেই আরো কী কী গেয়েছিলাম। এইটুকু শুধু মনে আছে যে খুশি লেগেছিল। লাগবে না আবার! আমরা যে শুনেছি কীভাবে ঘাস বাড়ে। আমরা যে দেখেছি কীভাবে চোখের সামনে চারিদিকটা জীবন্ত আর নতুন হয়ে ওঠে।

আলেক্সান্দর ব্লক

ভূমিকা
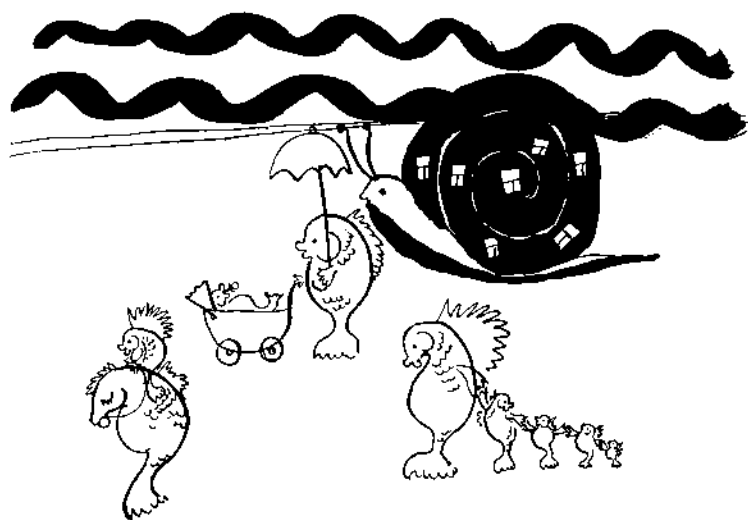
ত্যুলকা মেয়েটির চোখদুটি নীল, মাথায় মজার দুটি বেণী, একটা চাকার মতো, আরেকটা ছাগলের শিঙের মতো। জেলেদের জোট বরাবর মনমরার মতো সে হাঁটছে। মাথার ওপর হাসিখুশি হালকা মেঘ, উড়ে বেড়াচ্ছে হাসিখুশি গাঙচিল, হাসিখুশি রোদ্দুর চারিদিকে, কিন্তু মেয়েটির মন ভার। চুপ করে তাকিয়ে দেখছে সমুদ্রের দিকে।

আর সে কী সমুদ্র! এই নীল। এই আবার ছেয়ে সবুজ। হঠাৎ একেবারে সোনালী। কিন্তু ত্যুলকার চোখ অন্য দিকে... দূরের ওইখানটায়, যেখানে সবচেয়ে নীল, সেখানে সমুদ্রের গভীরে আছে গন্ধকী-হাইড্রোজেনের রাজ্য, জীবন্ত সবকিছুই মারা পড়ে তাতে, কাঁকড়া, মাছ, জেলি ফিশ, এমন কি সিন্ধুঘোটক পর্যন্ত...

এই বিছছিরি গ্যাসটার কথা সে শুনেছে স্কুলের শিক্ষিকা আল্লা ফেদোরভনার কাছ থেকে। সেই থেকে ত্যুলকার মনে শান্তি নেই।

'কীরে ত্যুলকা, মনমরা কেন?'

স্ট্র-হ্যাট্ পরা ঢ্যাঙা এক জেলে স্নেহের সুরে বললে চোখ মটকিয়ে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে ত্যুলকা। বললে:

'ভিক্তর কাকু, ছোটো বড়ো কোনো মাছই আমাদের আর বাঁচবে না... একটা বিষাক্ত গ্যাস আছে... তাকে বলে গন্ধকী-হাইড্রোজেন...'

'হ্যাঁ, তা আছে বটে,' সায় দিলে সে, কিন্তু কোনো রকম দুশ্চিন্তা দেখা গেল না। মুখখানা একেবারে নিশ্চিন্ত আর চোখদুটোয় একটা দুষ্টু দুষ্টু ব্রোঞ্জ-রঙা ঝলক।

রেগে ভেঙচি কাটল ত্যুলকা, 'আছে, আছে!' 'আছে... তা, লোকে ভাবছে-টা কী?'

'লোকের ভেবে হবে-টা কী। ভেবে শুধু কপাল ঘামবে, ত্যুলকা।'

অন্য সময় হলে জেলেদের এই বেয়াড়া রসিকতায় ত্যুলকা হেসে উঠত, এবার কিন্তু সে সরে গেল গোমড়া মুখে।

বুড়ো আলেক্সেইয়ের কাছে গেল সে। ময়দার দোকানের সামনে বসে সে কড়া তামাকের পাইপ টানছে। মুখখানা তার ভার-ভার, কাটা দাগে ভরা। একবার রাতে সমুদ্রের ঝোড়ো ঢেউয়ে তাকে নৌকা থেকে আছড়ে ফেলে পাথরের ওপর দিয়ে হেঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল। লোকটার ভয়ডর নেই, সমুদ্র আর সমুদ্রের জীবকে সে ভালোবাসে। নিশ্চয় ত্যুলকার কথায় সে কান দেবে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, ভিক্তর কাকুর মতো আলেক্সেই দাদুরও এতটুকু দুশ্চিন্তা দেখা গেল না।

আরো মুখ-ভার করলে ত্যুলকা। না, সমুদ্রের কথা কেউ ভাবতে চায় না, অথচ দিনরাত মাছ আনছে ওই সমুদ্র থেকেই... আর তাকে কিনা ঠাট্টা, বলে ত্যুলকার মাথা খারাপ হয়েছে।

আর মাথার ওপর পাক দিতে দিতে গাঙচিলগুলোও ঠাট্টা করলে:

'ক্যাক্ ক্যাক্!'

'মাথা খারাপ হয়েছে...' হেসে উঠল হাওয়া।

হাসল না কেবল সমুদ্র, আদর করে সে শুধু তার ঢেউ দিয়ে মেয়েটির রোদপোড়া পাদুটি ধুইয়ে দিয়ে ফিসফিস করলে:

'তুই মেয়ে ধন্যি!'

ত্যুলকার ঘুম হয় ভারি বিচ্ছিরি। কেবলি স্বপ্ন দেখে গন্ধকী-হাইড্রোজেনের... স্বপ্নে সে আসে এক প্রকান্ড কালো বুড়োর মূর্তি ধরে, হাতগুলো যার অক্টোপাসের শুঁড়ের মতো। মোটা মাথা, উঠখো নাক, মোচওয়ালা। তাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যায় যত প্রাণী। ফ্যাকাশে হয়ে যায় কমলা রঙের সব সামুদ্রিক উদ্ভিদ। কালো হয়ে ওঠে জল। আতঙ্কে ছোটাছুটি করে মাছের ঝাঁক, আর ত্যুলকা একটা খড়্গ মাছ হয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মরণপণ লড়াই করে যায় ভোর পর্যন্ত...

মন খারাপ হয়ে ঘুম ভাঙে ত্যুলকার। দুনিয়ার কোনো সাগরে, কোনো মহাসমুদ্রে এখানকার মতো এত বেশি গন্ধকী-হাইড্রোজেন নেই। তার সঙ্গে লড়া উচিত। যুদ্ধ ঘোষণা করা দরকার। কিন্তু সবাই আগের মতো তার কথায় হেসে ওঠে। এমন কি ত্যুলকার বাবা, মাছ-ধরা জাহাজ 'নিনা'য় যিনি নেভিগেটর, তিনিও হেসে বললেন:

'ভাবনা নেই রে মেয়ে, বিজ্ঞানীরা একদিন আমাদের এই সমুদ্রকে সারিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে ঠিকই।'

বাপের হাসি ভালো লাগল না ত্যুলকার। রেগে পা দুমদাম করে সে বললে:

'আল্লা ফেদোরভনা বলেছেন যে আমাদের সমুদ্রের মরা এলাকাটা জ্যান্ত এলাকার কয়েকগুণ বড়ো।'

'নয় বড়োই হল, শুধু রাগ ফলাবি না, ওটা আমার ভালো লাগে না,' গলা চড়ালেন বাবা, 'বোকামি ছাড় ত্যুলকা।'

ত্যুলকা*? ত্যুলকা আবার কে? ওর আসল নাম তো ইউলকা। বাবাই তো ওই ত্যুলকা নাম চালিয়ে দিয়েছেন। যাক্ গে। ও নিয়ে ও রাগ করবে না...

'তোদের পাইওনিয়র সংগঠনের সঙ্গে কথা বলব, জরুরী কোনো কাজ দিক তোকে, তাহলে তোর মাথা থেকে ওই কালো বুড়োটা ভাগবে...'

'মোটেই ভাগাব না, দুনিয়ার মুখ যেন ও না দেখে! বরং শুয়োর ছানাটার পিলের মতো ফেটে মরুক!..'

ত্যুলকার দিদিমাও ঠিক এমনি ভাবেই গাল দেয়। শুনে না হেসে পারলেন না বাবা। বললেন:

---

* 'ত্যুলকা' মানে চুনোপুঁটি মাছ।

'নে হয়েছে, ঝগড়া করব না। তুই বরং সমুদ্রের দিকে চেয়ে দ্যাখ, কেমন জীবন্ত।'

সমুদ্রের দিকে চাইল ত্যুলকা। সত্যিই জীবন্ত, হাসিখুশি, তাজা। ত্যুলকার মুখে রোদ পড়েছে। আকাশের আলো। গ্রীষ্মকালের ঢেউয়ের আলো।

'নিনা' জাহাজের নেভিগেটর মেয়ের কাঁধে হাত দিলেন:

'আল্লা ফেদোরভনাকে বলিস যে মাছ এখনো সবার জন্যে কুলিয়ে যাচ্ছে।'

'মোটেই সবার জন্যে নয়!'

ত্যুলকার পছন্দ হল না বাবার কথা। ওঁর আর কী। অক্টোপাসের শুঁড়ের মতো হাতওয়ালা বুড়োটা তো আর রোজ রাতে ওঁর কাছে আসে না। বেণীদুটোয় হাত বুলোলে ত্যুলকা, যেটা চাকার মতো গোল আর যেটা ছাগলের শিঙের মতো খাড়া, দুটোতেই। বললে:

'বড়ো হয়ে আমি নিজেই হব বৈজ্ঞানিক...'

তখন আর স্বপ্নে নয়, দিনের আলোতেই লড়াই বাধবে কেলে বুড়োটার সঙ্গে। ত্যুলকাই জিতবে। সাগর তার কানায় কানায় ভরে উঠবে রুপোলী মাছে। হাজার হাজার বছর ধরে সকলেরই কুলিয়ে যাবে — কারো নালিশ থাকবে না। মঙ্গলগ্রহ থেকে ফিরে লোকে তার সমুদ্রের সোনালী মাছ খাবে পেট পুরে। অন্য গ্রহের লোকেদের খাওয়াবে। বলবে, আরো দাও...

আগামী দিনের লোকেদের কি জানা থাকবে তাদের জন্যে কত ভেবেছিল নীল-চোখ ছোট্ট ত্যুলকা?

আন্দ্রেই দুগিলেভ্‌স

কাসেতের টুপি

নাতিনার উদ্দেশে নিবেদিত

মাম্বেতের বয়স আট বছর। শীতের চারণমাঠে সে এল এই প্রথম।

সবই তার কাছে নতুন। ইচ্ছে হয় তক্ষুণি সারা এলাকাটা ঘুরে আসবে। ছুটে বেড়াবে ভেড়ার পালের পাহারাদার কুকুরগুলোর সঙ্গে। চেয়ে দেখবে তার আদরের শাদা-লেজো ভেড়াটাকে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, তার বাপ-মায়ের এখনকার ঘরটির তলে গিয়ে ঢুকবে, কেননা ওটা তো সাধারণ ঘর নয়, চাকায় বসানো। কোনো ভিত নেই তার, শুধু চারটে চাকা। সবচেয়ে আগে অবিশ্যি দরকার আশপাশটা দেখা।

মা-বাপে কিন্তু মাম্বেতকে ছাড়ছিল না। কেবলি জিজ্ঞেস করছিল গাঁয়ের লোকের খবর কী, কেমন আছেন দিদিমা, কাকু কী করছে...

এদিকে শীতের সন্ধে তো ছোট্ট। দেখতে না দেখতেই বাতি জ্বলে উঠল, শুরু হল রাতের খাওয়া। শুইয়ে দিল মাম্বেতকে। বললে, এতটা পথ, হয়রান হয়েছিস, ঘুমো।

মা লণ্ঠন জেবলে ভেড়াগুলোকে দেখতে গেল। বাবাও ঘুমতে গেলেন। গোটা দিনরাত ডিউটি দিয়েছেন তিনি, তাই সঙ্গে সঙ্গেই গোটা ঘর জুড়ে বাঁশি বাজাতে লাগলেন। ঘুমের সময় অন্য লোকের মতো তাঁর নাক ডাকে না, নাক দিয়ে শিস বেরয়।

সবই চুপচাপ হয়ে যাবার পর উঠল মাম্বেত, জানলার ওপর রাখা লণ্ঠনের ফিতেটা একটু বাড়িয়ে দিলে। জুতো পরলে। গায়ে চাপালে মায়ের ফার কোট, এতই সেটা জাবড়া যে ঠাণ্ডা, গরম, বৃষ্টি কিছুতেই ভাবনা নেই। বাপের মস্তো লোমের টুপিটা মাথায় দিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে এল কনকনে কালো অন্ধকারে।

তিয়ানশান পর্বতের* ফেব্রুয়ারির রাত অন্ধকার, হিমেল। বুনো বাতাস গজরাচ্ছে যেন ভুখা নেকড়ে, তাড়িয়ে আনছে কখনো তুষার কণা, কখনো বৃষ্টি, কখনো বা খোঁচামারা বরফ-ঝড়। রাখালদের সেই একলা ঘরের আশেপাশে ঝোপঝাড়ও নেই, বাগানও নেই। শুধু পাহাড়গুলোর মাঝখানে বারোমেসে বরফে ঢাকা এক সমভূমি। বিকেলে মাম্বেত যখন এসেছিল, তখন চারিদিকে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল, শোনা যাচ্ছিল। এখন ঝড়ের ফুঁসন্ত গর্জনে ভেড়ার ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না, সবাই তারা ঝড়ের ঝাপটা থেকে লুকিয়েছে ঘরের অন্য পাশে। কিছু যে দেখবে তাও অসম্ভব। থেকে থেকে শুধু শোঁ শোঁ অন্ধকারে দেখা দিচ্ছে একটা ঘোলাটে হলুদ ছোপ। ওটা মার লণ্ঠনের আলো, সারা রাত ভেড়ার পালের কাছে ঘুরবে মা।

মায়ের জন্যে মায়া হল মাম্বেতের। নিশ্চয় ভারি ঠাণ্ডা লাগছে মায়ের, ভয় লাগছে। মায়ের দিকে এগিয়ে গেল মাম্বেত।

---

* এশিয়ার পর্বতমালা, লম্বায় ২,৫০০ কিলোমিটার (সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমার মধ্যে — ১,২০০ কিলোমিটার)।

ঝড়ের ডাকে মা নিশ্চয় শুনতে পায় নি, মান্বেত এগিয়ে এসেছিল একেবারে কাছে। ভেবেছিল কথা কইবে, হঠাৎ দেখে মা এমনভাবে থেমে গেল যেন কী একটা অলক্ষণ দেখেছে। মাথা হেঁট করে বাতাসে তার বাঁ কানটা পেতে কী যেন শুনতে লাগল।

মান্বেতও থমকে গেল। চেয়ে দেখতে লাগল অন্ধকারে। ভাবল, মা নিশ্চয় ভেড়াদের কোনো একটা বিপদ টের পেয়েছে।

'আপা*, কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলে সে ভয়ে ভয়ে। কিন্তু ভেজা ভেজা ঘন বাতাসের ঝাপটায় তার কথাগুলো ডুবে গেল।

'আপা!' প্রাণপণে চিৎকার করে মান্বেত ছুটে গেল মায়ের কাছে।

'আহ্‌ তুই, মান্বেত! আমি এদিকে ভয়ে মরি। ভেবেছিলাম নেকড়ে ওঁৎ পাতছে। কিছুই দেখছি না, শুনছি না, আর পিঠ দিয়ে টের পাচ্ছি কে যেন রয়েছে, কাছিয়ে আসছে।'

'তুমি মা সব সময় বলো যে পিঠ দিয়ে টের পাচ্ছ। সে আবার কী?'

'শুধু আমার বেলায় নয় রে, সব রাখালের বেলাতেই তাই।' ছেলেকে ওয়াটারপ্রুফে ঢেকে বললে উরুমকান, 'সারা রাত হয়ত টহল দিলাম, কিছুই নেই। হঠাৎ মনে হয় হুঁশিয়ার, কে যেন পেছনে, গুঁড়ি মেরে যাচ্ছে পালের দিকে।'

শুনে মান্বেতের গা শিরশির করে উঠল।

'বুঝতে না বুঝতেই ছোটাছুটি লাগায় কুকুরে, ডাকতে শুরু করে।'

'আচ্ছা আপা, আজ তোমার পিঠে কিছু টের পাচ্ছ না?'

'ঠান্ডায় আজ এমন জমে গেছি যে নেকড়ে আঁচড়ালেও পিঠে কিছু টের পাব না।'

'ভেড়ার বাচ্চাগুলোও সব জমে যাবে।' সংসারী লোকের মতো নিঃশ্বাস ফেললে মান্বেত, 'শোনো মা, লণ্ঠনটা আমায় দাও, আমি টহল দেব, তুমি গিয়ে একটু আগুন পুইয়ে এসো।'

'কী যে বলিস, তুই বরং গিয়ে ঘুমো, গায়ের জোর জমিয়ে রাখ গে...'

অনিচ্ছায় ঘরে ফিরল মান্বেত। দরজার কাছে সে থামল। কান পেতে কী শুনল। ঝড়ের আওয়াজ এখন খানিকটা কম। কখনো এখানে, কখনো ওখানে ভেড়াদের ঘুমন্ত ডাক। বাড়ির ছাদে শুয়ে ছিল কইবাগার, ভুখা ব্যাজারের মতো হাই তুললে সে। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে খুব। সন্ধে থেকেই খিদে পেয়েছিল। কিন্তু রাখালেরা রাত্রে কুকুরকে খেতে দেয় না, যাতে জেগে থাকে। মান্বেত কিন্তু পারলে না। এই কড়া নিয়মটা ভেঙে একটুকরো মাংস এনে ছুড়ে দিলে ছাদের ওপর। উপোসী কুকুরটা তা সঙ্গে সঙ্গেই খপ করে লুফে নিলে দাঁত দিয়ে।

---

* আপা — মেয়েদের প্রতি সম্মানের সম্বোধন।

তারপর শুতে গেল মাম্বেত। তার ধারণা হয়েছিল কইবাগার এরপর আরো মন দিয়ে ভেড়ার পালের কাছে ওই ঘোলাটে হলদে আলোর ছোপটায় নজর রাখবে।

শান্ত হয়ে আসা পালটার চারপাশে সারা রাত টহল দেয় গিন্নি। কইবাগার হুঁশিয়ার হয়ে দেখে, আর হয়ত ভাবে, ঘুমুচ্ছে না কেন। যাই ঘটুক প্রথম শুনবে তো সেই, কইবাগার, নিদেনপক্ষে আকতাইলাক, আঙিনার উল্টোদিকে যে শুয়ে আছে ভেড়ার গোবরের স্তূপে। ও জিনিসটা সর্বদাই গরম। কর্তা হলে নিশ্চয় ঘরের ভেতর কোথাও গুটিসুটি মেরে তামাক টেনে ঘুমুবে। আর গিন্নি ওদিকে জেগে...

তুষারপাতে বুজে আসা চোখের ফাঁক দিয়ে কইবাগার সজাগ নজর রেখেছে ওই পাক-খাওয়া হলদে আলোর ছোপটায়।

হঠাৎ হাওয়ার উল্টো মুখটায় এসে গিন্নি থেমে গেল, কী যেন ভাবলে। বসলে, তারপর পা গুটিয়ে বসেই রইল।

আলোটা আর নড়ছে না দেখে মাথা তুললে কইবাগার, হুঁশিয়ার হয়ে কী যেন শুঁকলে, এবার সাবধান হতে হয়।

অথচ চারপাশে কেবল ঘুমন্ত ভেড়ার গন্ধ আর ঝড়ের গোমড়া গোঙানি।

হঠাৎ ঝোপটার ওদিক থেকে একটা কড়া বিদঘুটে বোটকা গন্ধ ভেসে এল। কইবাগারের পিঠে খাড়া হয়ে উঠল লোম। টান টান হয়ে লাফিয়ে নামল সে, চোখে পড়ল আকতাইলাককে, গোবরের ঢিপিটায় যে শুয়েছিল, সেও তাকিয়ে আছে আর্চা ঝোপটার দিকে।

তারপর দুজনেই যেন আগে থেকে সাঁট করে হঠাৎ সজোরে ডেকে উঠল, ছুটতে শুরু করল ঘুমন্ত পালটার চারপাশে।

দাঁত বার করে ক্ষেপে ডাকতে ডাকতে ছুটছিল তারা দুজন দুমুখে। মুখোমুখি হলে নিজেরাই কামড়াকামড়ি করতে চাইছিল, কিন্তু এত জোরে ছুটছিল যে তা সম্ভব হচ্ছিল না। অথচ থামাও চলে না। ছুটতে হবে, পালে বাইরের কাউকে ঢুকতে দেওয়া চলবে না।

'আঁ?' জেগে উঠে চেঁচিয়ে উঠল উরুমকান।

ভেড়ার পালটা একেবারে গায়ে গায়ে এঁটে দাঁড়িয়েছে, তাদের ঘিরে ছুটছে খেপা কুকুরদুটো, দেখেই উরুমকান বুঝল কাছেই কোথাও নেকড়ে এসেছে।

ঘরে গিয়ে স্বামীকে জাগাবে, অন্তত বন্দুকটা নিয়ে আসবে। কিন্তু কে জানে কটা নেকড়ে, কোথায় গুঁড়ি মেরে আছে। হয়ত খুবই কাছে কোথাও ফাঁক খুঁজছে। বন্দুক আনতে না আনতেই হয়ত ভেড়া মেরে পালাবে।

উরুমকান উকুরুকটা* টেনে নিয়ে লাফিয়ে উঠল ঘোড়ায়, সারা রাত খোঁটার কাছে এটাও

---

* ফাঁস লাগানো লম্বা ডাণ্ডা।

পাহারা দিচ্ছিল, ছুটল পালটার চারপাশে। দু'বার চক্কর দিতেই তার নজরে পড়ল কে'দো একটা নেকড়ে অনিচ্ছায় সরে যাচ্ছে।

'কইবাগার!' কুকুরকে ডাকলে উরুমকান, তারপর চাবুক হাঁকিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করে সে ছুটল নেকড়ের পেছনে।

জানোয়ারটা ফিরে তাকাল, ঝকঝক করে উঠল তার সবুজ চোখ, তারপরেই ছুট লাগাল।

'ওই! ওই! শয়তান!' কুকুর লেলাতে লেলাতে উরুমকানও ছুটল তার পেছনে।

আর্চা ঝোপগুলোর কাছে এসে ঘোড়া থামাল উরুমকান। কেবল এখনি তার নজরে পড়ল যে তার সঙ্গে এসেছে কেবল কইবাগার, আর সেও কেন জানি দূর থেকে আসা আকতাইলাকের ডাক শুনে দাঁত কেলিয়ে পিছু হটতে চাইছে—ফিরে যাবার হুকুম চাইছে। উরুমকান মনে মনে বুঝল যে এখানের চেয়ে পালের কাছেই কুকুরের প্রয়োজন বেশি, আওয়াজ করে সে কইবাগারকে ফেরত পাঠাল। বুদ্ধিমান কুকুরটাও মুহূর্তে মিলিয়ে গেল রাত শেষের ঘন অন্ধকারে।

উরুমকান বুঝল যে নেকড়েটার পাল্লা ধরা সহজে হবে না, আর ওদিকে পালে হয়ত সে না থাকলে বিপদ হতে পারে। কসম নিলে, আর কখনো সে বন্দুক ছাড়া হবে না।

বন্দুক, কুকুর আর লণ্ঠন—এই হল রাখালের সেরা সহায়, মুহূর্তের জন্যেও রাত্রে এদের হাতছাড়া করতে নেই।

হঠাৎ দূরে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল, তারপর দ্বিতীয়বার। তারপর আকতাইলাকের করুণ গোঙানি আর কইবাগারের মরিয়া ঘেউ ঘেউ। ঝট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে পালের দিকে ছুটল উরুমকান। ঘরটা থেকে আধকিলোমিটার দূরে কার সঙ্গে প্রচণ্ড কামড়াকামড়ি করছে কুকুরগুলো, আর আতঙ্কে চ্যাঁচাচ্ছেন তক্তরবাই।

কিন্তু উরুমকান যখন এসে পৌঁছল, ততক্ষণে সব শান্ত হয়ে গেছে। খোঁদলের মধ্যে পড়ে আছে একটা নেকড়ে, তার পাশেই চওড়া-বুক পরাক্রান্ত কইবাগার বসে বসে তার থাবার জখম চাটছে। আর তক্তরবাই কোলে করে নিয়ে আসছেন একটা ভেড়া।

'মেরে ফেলেছে?' চেঁচিয়ে উঠল উরুমকান, 'শাদা-লেজো?'

'না মারতে পারে নি। তা তুমি কেন ছুটে গেলে পাল ফেলে?'

'নেকড়ের পিছু নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ফাঁস ছুড়ব...'

'নেকড়েরা কি আর তোমার চেয়ে বোকা! ওরা এসেছিল দুটো দুদিক থেকে। জানোই তো নেকড়েরা একা আসে কদাচিৎ কদাচিৎ।'

'যাক বাবা, বেঁচে তো আছে!' খুশি হয়ে উঠল উরুমকান, ভেড়াটাকে ঘোড়ায় চাপিয়ে বললে, 'তুমি নেকড়েটা সরিয়ে নাও, ছাল ছাড়াও। কিন্তু বাচ্চাটা? শাদা-লেজোর বাচ্চাটা কোথায়?'

'পালে যদি না থাকে, তাহলে নেকড়ে নিয়েছে। তাহলে শুধু দুটো নয়, অনেক কটাই এসেছিল।'

ঘোড়া ফেরাল উরুমকান, মনে হল যে এই বুঝি অজানা জানোয়ারটাকে ধাওয়া করবে। কিন্তু সখেদে মাথা নেড়ে চলে গেল পালের দিকে। কষ্ট হচ্ছে বাচ্চাটার জন্যে। শাদা-লেজো উরুমকানের সবচেয়ে পেয়ারের ভেড়া। তার জন্যেই উরুমকান রাখালি করছে।

গত বছরের আগের বছর একবার খুব দুর্যোগ চলছিল। একপাল ভেড়া গিয়ে লুকিয়ে ছিল একটা শিলাপাহাড়ের নিচে। হঠাৎ সেখানে বরফের ধস নামে। মারা পড়ে বহু ভেড়া। অনেক বাচ্চাই মা হারায়। বাচ্চাগুলোকে যে যেভাবে পারে বাঁচাবার জন্যে দিয়ে দেওয়া হয় যৌথখামারীদের। উরুমকানের তখন কোলে ছেলে, কাজ করত না। কুড়িটি বাচ্চা সে নেয়। গরুর দুধ খাইয়ে বড়ো করে। তার জন্যে কলখজের ব্যবস্থাপকমণ্ডলী পুরস্কার হিশেবে তাকে একটা বকনা ভেড়া দেয়। ভেড়াটাকে ভারি পছন্দ হয় মাম্বেতের। সারা গা কুচকুচে কালো, লেজটা শুধু শাদা। তাই তার নাম হয় শাদা-লেজো।

শরতে ভেড়াটা যখন বড়ো হল, চরে চরে চর্বি জমাল অনেক, তখন উরুমকান ঠিক করল এবার জবাই করে মাংস করা যাক। তখন এসেছিল কলখজের সভাপতি।

'আরে!' শাদা-লেজোকে দেখে অবাক হয়ে যায় সে, 'দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ভালো হাতে পড়েছে। অন্য সবার এক বছুরে ভেড়াও এর চেয়ে ছোট... শোনো উরুমকান, কেমন হয় যদি রাখালির কাজে যাও? স্বামীর সঙ্গে খাটবে। ওর দোসরটা ভারি বুড়ো হয়ে গেছে, ঘোড়ায় চাপতেও পারে না।'

বলে কয়ে রাজী করাল। উরুমকান মাম্বেতকে দিদিমার কাছে রেখে চলে যায় ভেড়া খামারে, শাদা-লেজোকে কাটে না, কলখজের পালে নিয়ে আসে। বাচ্চা হোক।

আর এই তার পরিণতি! এর জন্যেই কি টহল দিলে উরুমকান। পেয়ারের ভেড়াটার প্রথম ছানাটিই গেল নেকড়ের পেটে। এখন দ্বিতীয় ছানার জন্যে বসে থাক...

শাদা-লেজোকে পালে রেখে উরুমকান ঘোড়াটাকে বাঁধলে বাড়ির কাছে, তারপর দেখতে গেল মাম্বেত কেমন ঘুমুচ্ছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখেই সে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি ছুটল ঘরের মধ্যে।

লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় বসে মাম্বেত ছোট্ট এক ভেড়ার ছানাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। কাঁপছে ছানাটা।

'শাদা-লেজোর ছানা!' চৌকাটে পা দিতেই চিনতে পারল উরুমকান। 'কোথায় পেলি? আর বাপ বললে নেকড়ে নিয়েছে!'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল মাম্বেত। ওর মুখভরা দুধ, সেই দুধ খাওয়াচ্ছে ছানাকে।

তারপর মুখের সবটা দুধ খাওয়ানোর পর মাম্বেত ভারিক্কি চালে বললে:

'ভয় পেয়েছিল নেকড়ে!' তারপর ধীরে-সুস্থে বলেছিল ঘটনাটা।

কুকুরের চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে যায়। বাবা বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমেই বন্দুক নিয়ে ছুট দেয়। মাম্বেতও লণ্ঠন নিয়ে যায় তার পেছু পেছু, ভেবেছিল তাড়াহুড়োয় বাবা বোধ হয় লণ্ঠনের কথা ভুলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই বাপ অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে যায়। ভয় তাড়াবার জন্যে মাম্বেত লণ্ঠনের ফিতে বাড়িয়ে দেয় পুরোপুরি। লণ্ঠনটা উঁচুতে তুলে ঘরের কাছে সেঁটিয়ে আসা পালটাকে চক্কর দিতে গেল সে। যে গোবর ঢিপিটায় আকতাইলাক থাকে, ততদূর পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ দেখে এক ভেড়ার ছানা পাল ছাড়া হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে।

'নিশ্চয় মাকে খুইয়েছে,' এই ভেবে মাম্বেত দৌড়ে বোকা ছানাটাকে ধরে ওভারকোটের তলে জড়িয়ে নেয়। লণ্ঠনটা তার পেছনে। সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মা-ও নেই, বাবা-ও নেই। কুকুরগুলো যেখানে অমন খেপে ডাকছে, হয়ত তারই কাছাকাছি আছে কোথাও।

হঠাৎ মাম্বেত যেন দুটো সবজে চোখ দেখতে পেলে। সবুজ চোখ! জ্বলছে! তারপর ঝলক দিল দাঁত... লম্বা... শাদা শাদা... এগিয়ে আসছে সে দাঁত, কড়মড় করছে এমনভাবে যে পিঠ হিম হয়ে আসে।

ছানাটা যাতে না চেঁচায় তার জন্যে তাকে আরো জোরে চেপে ধরল মাম্বেত। ডাকলেই নেকড়ে শুনতে পাবে। হঠাৎ লণ্ঠনটার কথা মনে পড়ল। পেছনে না চেয়েই এক হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে সেটা ধরে। তারপর সেটা সামনে রাখে এক বর্মের মতো করে। অমনি দাঁত, সবজেটে চোখ সব কোথায় মিলিয়ে যায়। সামনে, একেবারে কাছেই শুধু দুলছিল কী একটা ঘাসের শীষ।

কে জানে সত্যিই নেকড়ে কিনা। আসলে সবচেয়ে বড়ো কথা মাম্বেত ঘাবড়ে যায় নি, লণ্ঠনটার কথা ভাবতে পেরেছিল...

ছেলের গায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে মা বললে:

'ছানাটা বড়ো হোক, তার লোম দিয়ে তোর চমৎকার টুপি বানিয়ে দেব।'

'সভাপতি যেমন পরে, তেমনি?' খুশি হয়ে উঠল মাম্বেত।

তার ধারণা, কলখজের সভাপতির সাজগোজ দুনিয়ার সবার চেয়ে সেরা।

* * *

দিন কয়েক গেল। মাম্বেতের বাঁচানো বাচ্চাটা বড়ো হয়ে উঠেছে, গা ভরা তার ঝাঁকড়া লোম, পালের মধ্যে সবচেয়ে দুরন্ত। একদিন সন্ধেয় বাবা মাম্বেতকে ডেকে বললেন যে ওটাকে জবাই করতে চায়।

'জবাই করবে? বাচ্চা ছানাকে জবাই?' মাম্বেত ভয়ানক হাত নেড়ে কে'দে ফেলল। 'দেব না জবাই করতে। নেকড়ে থেকে ওকে বাঁচালাম কি জবাই করার জন্যে? কী বলো? আমাকে তাই পেয়েছ?'

'না রে, না,' শানানো ছুরিটা লুকিয়ে রেখে বললেন বাবা, 'কিন্তু টুপি বানাব কী দিয়ে?'

'কেন, জ্যান্ত ছানার লোম ছাড়া হয় না বুঝি?'

'তাহলে তুই নিজেই বল কী দিয়ে?'

'কিছু দিয়েই দরকার নেই, আমার টুপিটা এখনো চলবে।' এই বলে মাম্বেত তার পুরনো টুপিটায় জোরে টান দিতেই তার চোখ ঢেকে গেল, আরেকটু টানলে নাকও ঢাকা পড়ত।

নীরবে চলে গেলেন বাবা।

সন্ধ্যায় এল কলখজের সভাপতি। ঘটনাটা সবই বাবা তাকে বললেন।

মাম্বেতের কাছে এল সভাপতি — ছেলেটা তখন শোবার জোগাড় করছিল। কাঁধে তার ভারি জোরালো হাতখানা রেখে বেশ গুরুগম্ভীর গলাতেই বললে:

'তা বটে, আঙুল দিয়ে তুই ঘি গলতে দিবি না। এমন একটা সহকারী পেলে তো বাঁচি।'

এর পর অনেকক্ষণ ঘুম আসে নি মাম্বেতের, কেবলি ভেবেছে সভাপতি নিন্দে করে গেল, নাকি প্রশংসা। কেবল সকালে যখন বাবা গেলেন ভেড়া দেখতে, আর মা ফিরল জিরতে, তখন মাম্বেত জানল যে ঘি গলতে না দেওয়ার মানে কলখজের ধনদৌলৎ নষ্ট করতে না দেওয়া।

'আচ্ছা আপা, জুনুসভ আমায় সহকারী করে নেবে?'

'নেবে, তবে তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে ওঠ!' বিছানায় গা এলিয়ে বললে মা।

'আর সভাপতির মতো আমারও দাড়ি গজাবে?'

'গজাবে। বেশি করে রোদ্দুরে ঘুরে বেড়া, তাহলে ভালো গজাবে।'

ঘুমন্ত মায়ের কোল ঘে'সে ঠিক ভেড়ার ছানার মতোই আদর কাড়লে মাম্বেত।

* * *

মার্চের প্রথম রাত। বরফ গলে গেছে, ফলে রাত হয় মিশমিশে কালো। পাহাড় থেকে বয় হিমেল বাতাস। সেই সঙ্গে ঝিরঝিরে, বালির মতো খরখরে বৃষ্টি। ঠাণ্ডায় এমন ঘে'সাঘে'সি করে আছে ভেড়াগুলো যে পা ফেলার জায়গা নেই। যে সব ভেড়ার বিয়োবার কথা, তাদের পক্ষে এটা খুবই খারাপ। ঘে'সাঘে'সিতে থে'তলে যাবে নতুন ছানা। আর উরুমকান আর তক্তরবাই যেন জেনেই রেখেছে যে এই অলক্ষুণে রাতটাতেই অনেকগুলো ছানা বিয়োবে।

এমন রাতকে রাখালেরা বলে বহু বিয়োনির রাত। সন্ধে থেকেই পালা করে তারা ডিউটি দিচ্ছে। একজন আগুন পোয়ায়, অন্যজন পালের চারপাশে ঘোরে। একটু ক্লান্ত হয়, শীত করে, তখন যায় আগুন পোয়াতে। বদলে আসে অন্যজন। আজ একজনে চলবে না।

রাখালদের কাজই এই। শীত গ্রীষ্ম দিন রাত কখনো তাদের বিশ্রাম নেই। সীমান্ত রক্ষীর মতো সর্বদাই তারা সজাগ। কিন্তু বসন্তকালে বিয়োনির সময়টাই সবচেয়ে কষ্টকর। রাখাল তখন চোখ মেলে, সজাগ কান পেতে ঘুমোয়।

মাম্বেতও এ রাতটায় ঘুময় নি। মা-বাপকে না জানিয়ে সে আশা করে আছে নবজাতকের ডাক শুনবে সেই প্রথম। ইচ্ছে হচ্ছিল সবার আগে গিয়ে গরম কোঁকড়া-লোমো ভেড়ার ছানাটিকে সে কোলে নেবে।

বাপ বলেছিল রাতটা হবে ঠান্ডা, তাই সন্ধে থেকেই মাম্বেত চালের ওপর খড় পাততে শুরু করে, কুকুরটা গরমে থাকবে। কিন্তু এর জন্যেও বকুনি খেল বাপের কাছে; বললে, গরমে কুকুর ঘুমিয়ে পড়বে, ভেড়া পাহারা দেবে না। কিন্তু মাম্বেত শুধু যে তার বিশ্বাসী বন্ধুটির জন্যে গরম বিছানা পাতল তাই নয়, পেট পুরে খাওয়ালও। এর জন্যে কইবাগার আরো ভালো করে তার কাজ করবে। মাম্বেত তা নিজের চোখে দেখেছে। চালে চাপতেই কুকুরটা সানন্দে দাঁত দেখাল, আদর করে ঝাপটা মারলে লেজের।

'শুয়ে থাক কইবাগার, শুয়ে থাক,' মাম্বেত তার ঘন, ঝাঁকড়া ভেজা লোমে হাত বুলিয়ে বললে। 'শুধু একটু সরে শো, খড়গুলো ভেজা। হ্যাঁ, এইখানে।'

আর মাম্বেতও কুকুরের গায়ে গরম খড়ের মধ্যে শুয়ে পড়ল।

বাড়িটা থেকে কিছু দূরে অন্ধকারে মিটমিট করছে লণ্ঠনের ফ্যাকাশে হলদে আলো। চুপ করে আছে ভেড়াগুলো, নিঝুম হয়ে আছে ঠান্ডা অন্ধকার রাতটায়।

পালটা ঘিরে টহল দিচ্ছে মা, জানে না যে আজ সে একা নয়। কল্পনাই করতে পারবে না কতগুলো চোখ আজ পালের দিকে নজর রেখেছে।

জমে যেতে শুরু করেছে মাম্বেত। কলারের ফাঁক দিয়ে চুইয়ে আসে বৃষ্টি। ঠান্ডা ফোঁটাগুলো গিয়ে ঠেকছে গায়ের চামড়ায়, বরফের মতো গড়িয়ে যাচ্ছে পিঠ বেয়ে। মাম্বেত কেঁপে কেঁপে ওঠে আর ভাবে, নিশ্চয় পেছনে নেকড়ে ওঁৎ পাতলে মার পিঠটাও এমনি ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে।

কিন্তু আস্তে আস্তে বৃষ্টি থেমে এল। বাতাসে শুকিয়ে গেল কুকুরটার ভেজা লোম। ভেজা রইল শুধু মাম্বেতের পুরনো ওভারকোটটা। কইবাগারের বুকের তাপে হাত গরম করে নিলে মাম্বেত। তাহলেও এমন জমে গেল যে ভেড়াগুলোর কাছে এক পাল নেকড়ে দেখলেও সে চ্যাঁচাতেও পারত না, নড়তেও পারত না।

বাতাস প'ড়ে আসায় খড়ের স্তূপটার খড়খড়ানি ক্রমেই থেমে আসছে। তারপর একেবারে থেমে গেল। রইল শুধু ঘুমন্ত বাবার মতো একটু শিসের শব্দ। এই প্রায় না শোনা শিসটা তার কাছে কখনো মনে হচ্ছে ঘুমন্ত কুকুরের খেঁকুনি, কখনো বা দূরের কোনো ভুখা নেকড়ের ডাক।

কালচে নীল আকাশে ফুটল ফিরোজা রঙের তারা। দ্রুত সেটা কাছিয়ে আসতে লাগল।

'স্পুৎনিক!' চট করে ধরে ফেললে মাম্বেত, উল্লাসে চাপড় মারলে কইবাগারের ঘাড়ে, 'গাঁয়ের ছেলেরা সব ঘুমুচ্ছে, দেখতে পেল না। তুই আর আমিই প্রথম স্পুৎনিক দেখলাম!'

উড়ে চলে গেল স্পুৎনিক, অনেকক্ষণ চারিপাশটা যেন আলো হয়ে রইল। হয়ত সেটা আকাশে, হয়ত মাম্বেতের মনে। আনন্দের ফলে যে রাতও হয়ে ওঠে দিনের মতো ফরসা।

নানা কথায় মন ভেসে যাচ্ছে মাম্বেতের। হঠাৎ নিচু থেকে নরম, আহ্লাদী, কাঁপা কাঁপা একটা শব্দ ভেসে এল।

নিঃশ্বাস বন্ধ করলে মাম্বেত।

'ভ্যা-া-া!' এবার আরো স্পষ্ট করে শোনা গেল নতুন বিয়োনো ভেড়ার বাচ্চার মিহি গলা।

ওহ্, লাফিয়ে উঠল মাম্বেত, চেঁচিয়ে উঠল!

চোখে আর ঘুম নেই, গায়ে ঠান্ডা নেই। প্রায় ডিগবাজি খেয়ে সে নড়বড়ে সরু মইটা বেয়ে নামল। একেবারে কাছেই, সদ্যোজাত ছানাটা যে কোথায় ডাকছে তা ধরতে এতটুকু অসুবিধা হল না।

'আপা, বিইয়েছে! বিইয়েছে!' ঘুমন্ত ভেড়াগুলোর মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে চ্যাঁচাল মাম্বেত।

মা যখন এসে পোঁছল, ততক্ষণে মাম্বেত ভেজাভেজা কোঁকড়া-চুলো বাচ্চাটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়েছে। লণ্ঠনের আলোয় ছানাটাকে লক্ষ করলে মাম্বেত।

'আপা, এটারও কিন্তু শাদা লেজ!' খুশি হয়ে উঠল মাম্বেত, 'হয়ত শাদা-লেজোর জ্ঞাতি।'

প্রসূতি ভেড়াটার কাছে এসে মা বললে মাম্বেতকে:

'বাচ্চাটাকে গরমে নিয়ে যা, আর বাপকে ডাক। ভেড়াটাকে ঘরে নিয়ে যেতে হবে। মনে হচ্ছে আরো বাচ্চা হবে।'

আনন্দে চিৎকার করতে করতে মাম্বেত ছুটল ঘরে, ঘুম থেকে উঠে বাবাও ছুটলেন পালের দিকে। মাম্বেত লণ্ঠনের ফিতে বাড়িয়ে দিয়ে কাঁপা কাঁপা লম্বা ঠ্যাঙের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলে ছানাটাকে। জোরে ডেকে উঠল বাচ্চাটা, বিজয় গর্বে শাদা লেজটুকু একটু নাড়ালে।

'এবার তাহলে তিনটে শাদা-লেজো!' মাম্বেতের খুশি আর ধরে না।

সকালের দিকে আরেকটা বাচ্চা বিয়োলে ভেড়াটা, শাদা খুর, চাঁদ-কপালী, এরও লেজটা শাদা।

'চারটে, চারটে শাদা-লেজো!' আনন্দে লাফিয়ে বেড়াল মাশ্বেত আর সারা দিন যত্রতত্র লিখে বেড়াল '৪' সংখ্যাটা।

সেদিন অনেক ভেড়ারই বাচ্চা হল। জমজ জন্মেছিল এত যে আনন্দে মা পাহাড়প্রমাণ 'বোরসাক' ভাজলে। কেকের মতোই এ পিঠে ভারি সুস্বাদু।

বাবা একেবারে পেট পুরে খেলেন, খুশির সুরে মাশ্বেতকে বললেন:

'তা এই-যে ছানাটাকে তুই ধরলি, এটা থেকেই নয় তোর টুপি করে দেব। দুটো বাচ্চাকে খাওয়ানো তো মায়ের পক্ষে কঠিন হবে, দুধে কুলবে না।'

মাশ্বেত চুপ করে রইল, ভাব করলে যেন কথাটা কানে যায় নি।

দিন দুই পরে এল ডাকপিয়ন মেয়েটি, দিদিমার চিঠি আর খবরের কাগজ এনেছিল সে। কাগজে মাশ্বেতের মা আর বাবার ছবি। তাদের নাম দিয়েছে আলোকস্তম্ভ। পিয়ন মেয়েটিই তাই বললে। মাশ্বেত অনুমান করলে, আলোকস্তম্ভ বলেছে কারণ রাত্রে তারা আলো নিয়ে ঘোরে, নেকড়ে আসতে দেয় না।

মাশ্বেত যখন খবরের কাগজে ছবিটা দেখছিল, বাপ তখন চিঠি লিখছিলেন কলখজ সভাপতিকে। লিখছিলেন তিনি ধীরে ধীরে, যেন পাহাড় বেয়ে উঠছে কাছিম, অক্ষরগুলো হচ্ছিল বড়ো বড়ো, মোটা মোটা, যেন মুরগীর ভেজা পায়ের দাগ। চিঠি লিখে সেটা পিয়ন মেয়েটির হাতে দিয়ে চলে গেলেন। পিয়ন মেয়েটির মন খুব ভালো, দুনিয়ার সবচাইতে সুন্দরী মেয়ে। চিঠিটা সে পড়ে শোনালে মাশ্বেতকে। ওদের দুজনেরই ভারি আনন্দ হল যে বিয়োনি মরশুমের প্রথম দিন মাশ্বেত কত সাহায্য করেছিল সে কথা জানাতেও বাবা ভোলেন নি... ভারি ভালো এই পিয়ন মেয়েটি; নামটিও যে অমন নরম, সেও খামোকা নয়: আইগুল — শাদা ফুলটি।

* * *

শেষ পর্যন্ত শীত ফুরুল, বন্ধ হল হিমেল পাহাড়ী বাতাস। তুষারঢাকা পাহাড় থেকে নামা স্রোতগুলোর সঙ্গে ভেসে ভেসে আসে কত ফুল। নীল, লাল, হলদে, সবরকম।'

সবচেয়ে হাসিখুশি রোদভরা একটা দিনে আবার এল সভাপতি...

সবচেয়ে তুষারঢাকা পাহাড়গুলোতেই ভেড়া চরান বাবা। এখান থেকে গোটা পালটাকে মনে হচ্ছিল যেন বসন্তের কচি ঘাসের ওপর ছড়ানো এক মুঠো নুড়ি।

ঘরদোর গোছগাছের কাজে লেগেছে মা, পয়লা মে'র পরবের জন্যে তৈরি হচ্ছে, মাশ্বেত সাহায্য করছে তাকে।

ঘরের পেছনে ঘোড়া রেখে এসে সভাপতি অভিনন্দন জানাল মাকে, করমর্দন করলে মাম্বেতের সঙ্গে। জিজ্ঞাসাবাদ করলে কেমন কাজ চলছে, পাল কত বাড়ল...

জুনুসভ একদৃষ্টে চেয়েছিল মাম্বেতের দিকে, লম্বা কালো দাড়িটায় হাত বুলোচ্ছিল। মোটেই বুড়ো নয় ও। লোকে বলে, দাড়ি রেখেছে কেবল ভারিক্কি দেখাবার জন্যে। যখন ওকে সভাপতি করে, তখন ওর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি। ভয় পেয়েছিল, এত অল্পবয়সীকে কেউ মানবে না। তাই দাড়ি রাখতে শুরু করে।

মাম্বেতের সামনে দাঁড়িয়ে সভাপতি দাড়ি নেড়ে খোঁচা খোঁচা বিরাট ভুরুদুটো কুঁচকে গম্ভীর গলায় বললে:

'তাহলে কমরেড মাম্বেত তক্তরবায়েভ, গুজব রটেছে যে তুই নাকি আবার পুরস্কার নিতে আপত্তি করেছিস, টুপির জন্যে ভেড়া কাটতে দিচ্ছিস না?'

প্রথমে মাম্বেত ভেবেছিল বুঝি বকতে এসেছে। তারপর ব্যাপারটা বুঝে ঠিক বাপকে যা বলেছিল তাই বললে:

'জ্যান্ত বাচ্চা কেটে যে টুপি করা চলে না!'

'সাবাস! চমৎকার মানুষ হবি! চমৎকার!' আগের মতোই গম্ভীর গলায় বললে সভাপতি, 'আয়, দুজনে মিলে মস্কোয় একটা চিঠি পাঠাই, টুপি করার জন্যে জীবন্ত ছানা কাটা যেন একেবারে নিষিদ্ধ করে দেয়।'

'বেশ, লিখব!' জ্বলজ্বল করে উঠল মাম্বেত।

'তারপর, এই নে ধর। এবার আমরা তোকে এমন একটা পুরস্কার দেব ঠিক করেছি যে আপত্তি করা অসম্ভব।'

জামার তল থেকে শেয়ালে লোমের একটা টুপি বার করে সভাপতি মাম্বেতকে দিলে। চুড়োটা ফিরোজা রঙের।

দুই হাত বাড়িয়ে ছেলেটা টুপিটা এমনভাবে নিলে যেন একটা ভারি ঠুনকো, হাওয়াই ফুলদানি ধরছে। তারপর বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

সত্যিই টুপিটা সোনালী বেড় দেওয়া একটা নীল ফুলদানির মতো। ফিরোজা রঙের নীল মখমলটা যেন সত্যিই সূর্যোদয়ের একটুকরো আকাশ। ফুঁয়ো ফুঁয়ো ফারটা ঝলক দিচ্ছে যেন জীবন্ত শেয়াল।

'নে, এবার পরে দ্যাখ,' এবার হেসে বললে সভাপতি, 'এটা তুই খেটে রোজগার করেছিস!'

আর মা সে সময় কেন জানি চোখের জল মুছতে লাগল। ভারি অদ্ভুত মা-টা। জানে না কখন কান্নার সময়, কখন আনন্দের।

মাম্বেত টুপির ভেতরে টিউলিপ ফুলের মতো লাল রেশমী আস্তরটার দিকেও চাইলে। মাথা থেকে খুলে বাপের পুরনো টুপিটা। হাঁটু দিয়ে চেপে ধরল ওটাকে। এখনো কাজ দেবে। তারপর সন্তর্পণে নতুন, ফুরফুরে টুপিটা পরলে সগর্বে।

'এবার আমার ঘোড়াটায় চড়ে ঘুরে বেড়া,' বললে সভাপতি। 'গিয়ে বাপকে দেখিয়ে আয়।'

এতটা বদান্যতা মাম্বেত সত্যিই আশা করে নি।

কিছুক্ষণ পরেই যেন বাতাসের তোড়ে একটা রোদে ঝলমল ফুরফুরে সোনালী ফুল উড়ে গেল সবুজ প্রান্তর বরাবর।

'এমন টুপি পেলি কোথায়?' মাম্বেত আসতেই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন বাপ।

টুপিটা একটু বাঁকিয়ে সগর্বে বললে মাম্বেত: 'নিজেই রোজগার করেছি!'

সত্যি, গায়ের সমস্ত ছেলেদেরও মাম্বেত বুক ফুলিয়ে বলবে:

'নিজের রোজগার!'

ভিক্তর দ্রাগুনস্কি

সার্কাসের মেয়ে
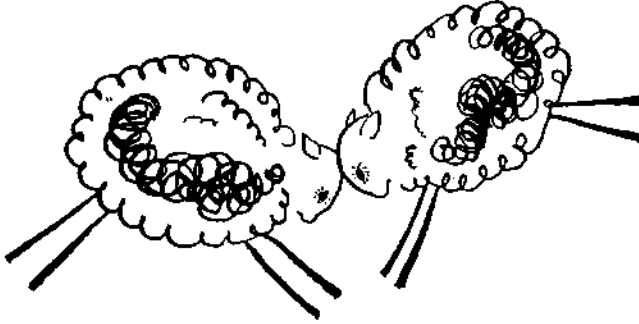
একবার আমরা গোটা ক্লাস গেলাম সার্কাসে। ভারি আনন্দ হল আমার, কেননা শিগগিরই আমার আট বছর পেরবে, অথচ সার্কাসে গেছি কেবল একবার, তাও অনেক দিন আগে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, আলিয়োশ্কার সবে ছয় বছর বয়স, কিন্তু সার্কাস দেখেছে তিন তিনবার। কষ্ট হয় না? তারপর তো গোটা ক্লাসই আমরা এলাম সার্কাসে। ভাবলাম, ভাগ্যি এখন আমি বড়ো হয়েছি, যেমন করে দেখা দরকার সব দেখব। তখন আমি ছিলাম ছোট্ট, সার্কাস কী তা ভালো বুঝি নি। সেবার যখন খেলা দেখাতে এসে একজন আরেকজনের মাথায় উঠে দাঁড়ায় তখন আমি হো-হো করে হেসে উঠেছিলাম, ভেবেছিলাম এটা ওরা ইচ্ছে করে করছে, রগড়ের জন্যে, কেননা বাড়িতে তো আমি কখনো দেখি নি যে অমন বড়ো সড়ো সব লোকে এ ওর ঘাড়ে ডিগবাজি খাচ্ছে। রাস্তাতেও দেখি নি। তাই একেবারে হো-হো করে হেসে উঠেছিলাম। মোটেই বুঝি নি যে খেলোয়াড়রা তাদের কসরত দেখাচ্ছে। তাছাড়া সেবার আমি সবচেয়ে বেশি করে দেখছিলাম অর্কেস্ট্রাটা, কীভাবে বাজাচ্ছে, কে ড্রামের কাছে, কে শিঙায়, কনডাক্টর ছড়ি দোলাচ্ছে, কিন্তু কেউ তার দিকে চেয়ে দেখছে না, নিজের মনেই বাজিয়ে চলেছে। সেটা ভারি ভালো লেগেছিল আমার, কিন্তু আমি যখন বাজিয়েদের দেখছিলাম, তখন ওদিকে খেলা দেখাচ্ছিল আর্টিস্টরা। কিন্তু আমি খেয়ালই করি নি, কতো ভালো ভালো ফসকে গেল। তবে তখন তো আমি একেবারেই হাঁদা ছিলাম।

তা গোটা ক্লাসই আমরা এলাম সার্কাসে। ভারি ভালো লাগল যে সার্কাসটায় কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ, দেয়ালে জ্বলজ্বলে সব ছবি, চারিদিক আলোয় আলো, মাঝখানে একটা চমৎকার গালিচা, সিলিঙটা ভয়ানক উ'চু, সেখানে নানা ধরনের ঝকমকে সব দোলনা। এই সময় বাজনা বেজে উঠল, সবাই তাড়াতাড়ি গিয়ে সীটে বসল, তারপর আইসক্রীম কিনে খেতে লাগল। হঠাৎ লাল পর্দার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল নানা রকম সব লোক, চমৎকার তাদের সাজ, হলদে হলদে ডোরাকাটা লাল লাল স্যুট। পর্দার দুপাশে দাঁড়িয়ে গেল তারা, আর মাঝখান দিয়ে হে'টে এল কালো স্যুট পরা তাদের ম্যানেজার। জোরে কী যেন সে বললে, তত বোঝা গেল না, সঙ্গে সঙ্গে বাজনা শুরু হয়ে গেল ঝাঁপতালে, আর খেলা দেখাতে ছুটে এল জাগলার। সে যা ব্যাপার! দশটা কি একশটা করে গোলা ছুড়ে দিয়ে সে লোফালুফি করলে। তারপর একটা ডোরাকাটা বল নিয়ে খেলা শুরু হল... মাথা দিয়ে, চাঁদি দিয়ে, কপাল দিয়ে, পিঠ দিয়ে, গোড়ালি দিয়ে সে সেটাকে ঠেলা দেয় আর বলটা তার গোটা শরীর বেয়ে গড়াগড়ি করে, পড়ে না। ভারি সুন্দর খেলাটা। হঠাৎ জাগলার বলটা ছুড়ে দিল আমাদের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল সত্যিকারের রগড়; কেননা বলটা লুফেছিলাম আমি, তারপর ছুড়ে দিলাম সেটা ভালেরকাকে, ভালেরকা মিশকাকে, মিশকা হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই ছুড়লে কনডাক্টরকে লক্ষ্য করে, তবে কনডাক্টরের গায়ে লাগল না, লাগল ড্রামটায়। দুম! ড্রাম যে বাজাচ্ছিল, রেগে গিয়ে সে বলটা ছুড়লে ফের জাগলারের দিকে, কিন্তু পৌঁছল না, পড়ল

গিয়ে সুন্দর খোপা করা এক মাসির মাথায়। ফলে খোপার দফা রফা। হেসে আমরা তখন মরি আর কি।

জাগলার পর্দার ওপারে চলে যাবার পরও আমরা অনেকক্ষণ শান্ত হতে পারি নি। সেই সময় গড়িয়ে নিয়ে আসা হল এক মস্ত নীল গোলা, আর যে লোকটা সব ঘোষণা করে সে মাঝখানে এগিয়ে এসে কী সব বললে, কিছুই বোঝা গেল না। ফের একটা ফুর্তির বাজনা শুরু হল অর্কেস্ট্রায় তবে আগের মতো অত ঝাঁপতালে নয়।

হঠাৎ ছুটে এল একটা বাচ্চা মেয়ে। অত ছোট্ট আর সুন্দর মেয়ে আমি কখনো দেখি নি। একেবারে টলটলে নীল চোখ, লম্বা রোঁয়া। পরনে রুপোলী ফ্রক, হাওয়াই রেনকোট, হাত দুখানা বেশ লম্বা, ডানার মতো দুলিয়ে মস্তো গোলাটার ওপর লাফিয়ে উঠল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তার ওপর, হঠাৎ ছুটতে লাগল, যেন গোলাটা থেকে লাফিয়ে নামতে চায়, আর গোলাটা ওদিকে ঘোরে, মনে হল গোলাটার ওপর মেয়েটা যেন ছুটছে, আসলে কিন্তু গোলাটাই গড়াতে লাগল রঙ্গভূমি ঘিরে। এমন মেয়ে আমি কখনো দেখি নি। সবাই যেন কেমন মামুলী, এ কিন্তু কেমন যেন অন্যরকম। ছোট্ট ছোট্ট পা দুখানা দিয়ে গোলার ওপর ছুটছে, যেন গোলা নয়, সমান মাঠ, আর নীল গোলাটা তাকে নিয়ে চলেছে সামনে, পেছনে, বাঁদিকে—যে দিকে খুশি চলে যাচ্ছে মেয়েটা আর ওভাবে যখন ছোটে, তখন খিলখিল করে হেসে ওঠে। মনে হয় যেন ভেসে যাচ্ছে, আর আমার মনে হল যেন মেয়েটা নিশ্চয় দুাইমভা*, কেননা ভারি ও ছোট্ট, মিষ্টি, অন্যরকমের। এই সময় থামল মেয়েটি, কে যেন ওকে নানা রকমের ঘুঙুর দিলে, হাতে পায়ে সেগুলো পরে মেয়েটা ফের আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল গোলাটার ওপর, যেন নাচছে। অর্কেস্ট্রাও তখন বাজনা ধরেছে আস্তে, বেশ শোনা যাচ্ছিল মেয়েটির লম্বা লম্বা হাতে সোনার ঘুঙুরগুলো কেমন মিহি আওয়াজ তুলেছে। সবটাই যেন একটা রূপকথার মতো। তখন আবার আলোটাও কমিয়ে দিয়েছিল, আর চারিদিকে মেয়েটা যেন ভেসে বেড়াল, জ্বলজ্বল করে উঠল, ঝুমঝুম করে চলল; ভারি আশ্চর্য লাগল, সারা জীবনে আমি এমনটি দেখি নি।

তারপর যখন আলো জ্বলে উঠল, সবাই হাততালি দিলে, চ্যাঁচাতে লাগল 'ব্রেভো!', 'ব্রেভো!' আমিও চ্যাঁচালাম 'ব্রেভো!' আর মেয়েটি তার গোলাটা থেকে লাফিয়ে নেমে সামনে এগিয়ে এল আমাদের কাছাকাছি, তারপর হঠাৎ ছুটতে ছুটতে শূন্যে ডিগবাজি খেলে, একবার, দুবার; ক্রমাগত ডিগবাজি খেয়ে গেল। মনে হল, এই রে, এই বুঝি রেলিঙে ধাক্কা লাগবে, তাই হঠাৎ ভারি ভয় হল আমার, লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, ইচ্ছে হল ছুটে যাই, গিয়ে ওকে ধরি যাতে ধাক্কা না খায়। হঠাৎ মেয়েটা একেবারে থেমে গেল যেন মাটিতে পোঁতা, তারপর

---

* ডেনিস সাহিত্যিক হ্যানস অ্যান্ডারসনের একটি চরিত্র।

তার লম্বা লম্বা হাতদুটো ছড়িয়ে দিলে, অর্কেস্ট্রা থেমে গেল, ওইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল সে। সবাই প্রাণপণে হাততালি দিলে, কেউ কেউ আবার পা দিয়েও শব্দ করতে লাগল। ঠিক এই সময়টায় মেয়েটা তাকালে আমার দিকে, আমি বেশ দেখতে পেলাম যে ও দেখতে পেয়েছে আমি ওকে দেখছি, আর আমিও দেখতে পাচ্ছি ও আমাকে দেখছে, আমার দিকে হাত নেড়ে হাসলে। কেবল আমার দিকেই হাত নেড়ে হেসেছিল মেয়েটা। ফের ইচ্ছে হল ছুটে যাই, হাত বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে। হঠাৎ আমাদের সবার দিকে হাওয়াই চুমু ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে চলে গেল লাল পর্দাটার ওপাশে, খেলা দেখিয়ে সমস্ত খেলোয়াড়ই যেখানে চলে যায়। তার পর মঞ্চে এল একটা ক্লাউন, হাতে মোরগ, শুরু করল হাঁচতে আর হোঁচট খেতে, কিন্তু তাতে একদম মন লাগল না। সারা সময়টা আমি কেবল গোলার ওপর মেয়েটির কথা ভাবলাম, কী আশ্চর্য মেয়ে, কেমন ভাবে হাত নাড়লে আমার দিকে, হাসলে, আর কোনো কিছু দেখবার ইচ্ছে হচ্ছিল না আমার। উল্টে বরং জোর করে চোখ বন্ধ করে রাখলাম যাতে ওই লাল-নেকো বোকা ক্লাউনটাকে দেখতে না হয়, কেননা মেয়েটার ছবিটা ও নষ্ট করে দিচ্ছিল, তখনো কেবলি আমার চোখে ভাসছিল নীল গোলার ওপর মেয়েটা।

তারপর ইণ্টারভ্যাল হল, সবাই ছুটল বুফেতে সিরাপ খেতে, আমি কিন্তু আস্তে আস্তে নিচে নেমে এলাম, গিয়ে দাঁড়ালাম সেই পর্দাটার কাছে, যেখান থেকে সব খেলোয়াড়রা আসে। ইচ্ছে হচ্ছিল আরেকবার মেয়েটাকে দেখি, তাই পর্দাটার কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম, হয়ত কখনো বেরিয়ে আসবে। কিন্তু বেরিয়ে এল না।

ইণ্টারভ্যালের পর সিংহের খেলা, মোটেই ভালো লাগল না, কেননা যে খেলা দেখাচ্ছিল, সে কেবলি সিংহগুলোর লেজ ধরে টানছিল, যেন সিংহ নয়, নির্জীব বেড়াল। সিংহগুলোকে এ টুল থেকে অন্য টুলে বসাচ্ছিল সে, নয়ত মেজের ওপর সারি সারি শুইয়ে তাদের ওপর দিয়ে এমন ভাবে হেঁটে গেল যেন ওগুলো সিংহ নয়, গালিচা, আর সিংহগুলোরও মুখের ভাব এমন বেজার, যেন বলতে চায় একটু শান্তিতে শুয়ে থাকতেও দিচ্ছে না। মোটেই মজার কিছু নয়, কেননা সিংহের উচিত ধু-ধু ঘেসো মাঠে বাইসন শিকার করা, ভয়ংকর তার গর্জনে চারদিক গমগম করা, লোকজন কাঁপতে থাকবে, আর এ যা দেখাচ্ছে এ যেন সিংহ নয়, কী যে তা আমি নিজেও বুঝছি না।

যখন শেষ হয়ে গেল, বাড়ি যাচ্ছি তখনও কেবলি মেয়েটার কথা ভাবলাম।

সন্ধ্যায় বাবা জিজ্ঞেস করলেন:

'তা, কেমন লাগল সার্কাস?'

আমি বললাম:

'বাবা জানো, সার্কাসে একটা ছোট্ট মেয়ে আছে। নীল গোলার ওপর সে নাচে। এমন

চমৎকার, সবচেয়ে সেরা। আমার দিকে চেয়ে হাত নেড়ে হেসেছিল। শুধু আমাকে, সত্যি বলছি। জানো বাবা, পরের রবিবারে সার্কাসে চলো, আমি ওকে দেখাব।'

বাবা বললেন:

'নিশ্চয় যাব। আমি সার্কাসের ভক্ত।'

আর মা আমাদের দুজনের দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেন এই প্রথম দেখছেন।

...শুরু হল লম্বাটে এক সপ্তাহ, আমি খাই দাই, পড়াশুনা করি, ঘুম থেকে উঠি, শুতে যাই, খেলি, এমনকি একবার মারামারিও করলাম, তাহলেও কেবলি ভাবতাম, কবে রবিবার আসবে, বাবার সঙ্গে সার্কাসে যাব, বাবা হয়ত মেয়েটাকে নেমন্তন্ন করবে আমাদের বাড়িতে, আমি ওকে আমার খেলনা পিস্তলটা দিয়ে দেব, রাশি রাশি পাল তোলা জাহাজ আঁকব।

কিন্তু রবিবারে বাবা যেতে পারলেন না। বন্ধুবান্ধবেরা এসেছিল তাঁর কাছে, কী সব নকসা টকসা ঘাঁটাঘাঁটি করে তারা চেঁচালে, সিগারেট টানলে, চা খেলে, বসে রইল অনেকক্ষণ, তারপর মায়ের মাথা ধরল।

বাবা বললে:

'পরের রবিবার, আমার ইজ্জতের কসম।'

আমিও পরের রবিবারের জন্যে এমনি মুখিয়ে ছিলাম যে টেরই পেলাম না কী করে আরো এক সপ্তাহ কেটে গেল। বাবাও কথা রাখলেন, আমাকে নিয়ে সার্কাসে গেলেন, টিকিট কিনলেন দ্বিতীয় সারিতে। এত কাছে বসতে পেরেছি দেখে ভারি আনন্দ হল আমার। খেলা শুরু হল, আমিও পথ চেয়ে বসে রইলাম কখন গোলার ওপরকার মেয়েটি আসে। কিন্তু যে লোকটা প্রোগ্রাম ঘোষণা করে, কেবলি সে অন্য খেলোয়াড়দের কথা বলে গেল, তারা এল গেল, নানা রকম কসরত দেখালে, কিন্তু মেয়েটির দেখা নেই। অধৈর্যে আমি স্রেফ কাঁপতে লাগলাম, ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল যে বাবা দেখুক তার রুপোলী সাজ আর হাওয়াই রেনকোটে কী আশ্চর্য দেখায় তাকে, নীল গোলাটার ওপর সে ছোটে কেমন খাসা। আর প্রত্যেকবার যখনই ঘোষক আসে আমি ফিসফিসিয়ে বাবাকে বলি:

'এইবার ও আসবে।'

কিন্তু লোকটা যেন ইচ্ছে করেই অন্য কারো নাম করছিল আর লোকটার ওপর আমার বিদ্বেষই ধরে গেল আর কেবলি বাবাকে বলছিলাম:

'ধুর! ধুর! ওঁছার ওঁছা। তেমনটি নয়।'

আর আমার দিকে না তাকিয়েই বাবা বলছিলেন:

'গোলমাল করিস নে। এটা দারুণ খেলা।'

ভাবলাম, এই খেলাটা যদি বাবার এত ভালো লাগে, তাহলে বোঝাই যাচ্ছে সার্কাসের

ব্যাপার বাবা তেমন বোঝেন না। গোলার ওপর মেয়েটিকে যখন দেখবেন তখন দেখব কী বলেন। নিশ্চয় সীট ছেড়ে লাফিয়ে উঠবেন দুই মিটার...

কিন্তু এই সময় ঘোষণার লোকটা এসে তার বোবা-কালা গলায় চ্যাঁচাল:

'ইণ্টার্ভ্যাল...'

নিজের কানকেই আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না! ইণ্টার্ভ্যাল? কেন? পরের অংশটায় তো কেবল সিংহের খেলা! কোথায় গেল আমার সেই মেয়েটি? কোথায় সে? খেলা দেখালে না কেন? অসুখ হয় নি তো? হয়ত পড়ে গিয়েছিল একবার, মাথায় চোট লেগেছে?

বললাম:

'বাবা, চলো গিয়ে জেনে আসি গোলার ওপরকার মেয়েটা কোথায়।'

বাবা বললেন:

'ঠিক, ঠিক কোথায় তোর সেই মেয়ে? দেখছি না তো। চল গিয়ে একটা প্রোগ্রাম কিনে দেখি!..'

বাবার মেজাজ তখন ভারি ভালো। চারিপাশে তাকিয়ে-টাকিয়ে হেসে বললেন:

'আহ্, ভারি ভালো লাগে আমার সার্কাস! এমন কি এই গন্ধটায়ই মাথা ভোঁ ভোঁ করে...'

আমরা বারান্দায় গেলাম। লোকের ঠেসাঠেসি সেখানে, চকোলেট, বিস্কুট সব বিক্রি হচ্ছে, দেয়ালের ফটোগ্রাফগুলোয় নানা বাঘের মুখ। আমরা খানিকটা ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত প্রোগ্রাম-বেচিয়ের দেখা পেলাম। বাবা মেয়েটির কাছ থেকে একটি প্রোগ্রাম কিনলেন। আমি আর পারলাম না, জিজ্ঞেস করলাম:

'বলুন না, গোলার ওপর মেয়েটি খেলা দেখাবে কখন?'

ও বললে:

'কোন মেয়ে?'

বাবা বললেন:

'প্রোগ্রামে লেখা আছে গোলার ওপর খেলা দেখায় ভরোনৎসভা। কোথায় সে?'

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

প্রোগ্রাম-বেচিয়ে মেয়েটি বললে:

'ও, তানেচকার কথা বলছেন? চলে গেছে সে, চলে গেছে। এত দেরি করলেন কেন?'

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাবা বললেন:

'দুসপ্তাহ ধরে আমরা আসব আসব করছি। তানিয়া ভরোনৎসভার খেলা দেখব ভেবেছিলাম, সেই নেই।'

মেয়েটি বললে:

'হ্যাঁ, চলে গেছে ও... মা-বাপের সঙ্গে... ওর মা-বাপেরা হল সেই 'ব্রোঞ্জের লোক', নাম শুনেছেন নিশ্চয়? ভারি আফশোসের কথা... মাত্র গতকাল চলে গেছে।'

আমি বললাম:

'দেখলে তো বাবা...'

বাবা বললেন:

'আমি তো আর জানতাম না যে ও চলে যাবে। কী আফশোস... ইস!.. তা কী আর করা যাবে, উপায় নেই...'

প্রোগ্রাম-বেচিয়েকে আমি শুধালাম:

'একেবারে চলেই গেছে?'

ও বললে:

'চলেই গেছে।'

আমি বললাম:

'কোথায়, জানেন?'

ও বললে:

'ভ্লাদিভস্তকে।'

ওরে বাবা! অনেক দূর। ভ্লাদিভস্তক। আমি জানি জায়গাটা মানচিত্রের একেবারে শেষ কোণে, মস্কো থেকে ডান দিকে।

আমি বললাম:

'অনেক দূর।'

হঠাৎ ও ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠল:

'যান যান, নিজেদের জায়গায় যান, আলো নিবিয়ে দিচ্ছে।'

বাবাও বললেন:

'চল, চল দেনিস্কা, এবার সিংহের খেলা। কেশর-ফোলা—ডাক ছাড়বে কী ভয়ঙ্কর! চল, ছুটি!'

আমি বললাম:

'বাড়ি চলো বাবা।'

উনি বললেন:

'তা যখন তুই...'

প্রোগ্রাম-বেচিয়ে মেয়েটা হেসে উঠল। আমরা কিন্তু সোজা ওভারকোট রাখার জায়গাটায় গিয়ে, ওভারকোট পরে বেরিয়ে এলাম সার্কাস থেকে। বুলভার দিয়ে হাঁটছিলাম আমরা, হাঁটলাম অনেকখন, তার পর আমি বললাম:

'ভ্লাদিভস্তক হল ম্যাপের একেবারে শেষ কোণে। ট্রেনে করে গেলে একেবারে পুরো এক মাস লেগে যাবে...'

বাবা চুপ করে রইলেন, বোঝা গেল আমার কথা শুনছেন না। আরো খানিকটা হাঁটলাম আমরা। হঠাৎ এরোপ্লেনের কথা মনে পড়ে গেল আমার। বললাম:

'কিন্তু 'তু-১০৪' এরোপ্লেন তিন ঘণ্টায় পেঁাছে যাবে!'

বাবা কিন্তু এবারেও জবাব দিলেন না। চুপ করে হাঁটছিলেন বাবা, জোরে হাত ধরেছিলেন আমার। যখন গর্কি স্ট্রিটে পড়লাম উনি বললেন:

'চল আইসক্রীম কাফেতে যাই। দু'প্লেট করে আইসক্রীম গেলা যাবে, কী বলিস?'

আমি বললাম:

'ইচ্ছে করছে না বাবা।'

উনি বললেন:

'ওখানে এক ধরনের জল বিক্রি করে, নাম তার 'কাখেতিনস্কায়া'। এর চেয়ে ভালো জল আমি দুনিয়ার কোথাও খাই নি।'

আমি বললাম:

'ইচ্ছে হচ্ছে না বাবা।'

উনি আর আমায় বোঝাবার চেষ্টা করলেন না। আমার হাতটা জোরে চেপে ধরে পা বাড়ালেন। হাতে বেশ লাগছিল। তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলেন বাবা, আমি প্রায় তাল রাখতে পারছিলাম না। কেন অমন তাড়াতাড়ি হাঁটছেন? কেন কথা বলছেন না আমার সঙ্গে? ইচ্ছে হল ওঁর দিকে একবার চেয়ে দেখি। মাথা বাড়িয়ে দেখলাম। মুখটা ওঁর ভারি গম্ভীর আর থমথমে।

ভ্লাদিমির জেলেজ্নিকভ

ছেলেটার জন্য রঙ

ছেলেটা বিমানে বসে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিল জানলা দিয়ে।

সূর্যের রোদে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, ছেলেটা কিন্তু তবু দেখছে।

মা বললেন:

'শোন বাছা, পর্দাটা টেনে দে, নয়ত পাশের চেয়ারটায় বস। এখানটা রোদ্দুরে বড়ো তেতে উঠেছে, তোর পক্ষে খারাপ।'

ক্ষুব্ধ চোখে ছেলেটি চাইল মায়ের দিকে। রোদে বসে থাকা যে ওর পক্ষে খারাপ সেটা ও চায় না যে কারো কানে যাক। বললে, 'এখানেই বেশ আছি, রোদে একটুও অসুবিধা হচ্ছে না।'

'বেশ,' বললেন মা, 'বসে থাক, আমি অন্য জায়গায় বসছি।'

অন্য দিকটায় গিয়ে বসলেন তিনি। ছেলেটা জানলা দিয়ে দেখেই চলল।

কেবিন থেকে বেরিয়ে এল পাইলট। সেই কম্যান্ডার। বসল ছেলেটার পাশে।

চেয়ে দেখল ছেলেটা। এবার তার পাশে বসেছে আসল একটা লোক। ইচ্ছে হল তার সঙ্গে একটু কথা কয়। পাইলট তা টের পেল। তার ক্লান্ত রুক্ষ মুখটা একটু নরম হয়ে উঠল, অভ্যাসবশেই সে জিজ্ঞেস করলে:

'ভালো লাগছে?'

'খুব ভালো,' বললে ছেলেটা।

'তুই-ও পাইলট হবার স্বপ্ন দেখছিস তো?'

একটু বিব্রত হল ছেলেটা। আদৌ পাইলট হবার কথা সে ভাবে না, কেননা ওর ফুসফুস খারাপ, জানত যে তার জন্যে ওর পাইলট হওয়া সম্ভব হবে না। মিথ্যেও সে বলতে পারে না, আবার সত্যি কথা বলতেও মন চাইছে না।

'আমি আঁকতে ভালোবাসি,' জবাব দিলে ছেলেটা। 'ওই দেখুন, মেঘগুলো এক পাল শাদা হাতীর মতো। সামনেরটার শুঁড়ের পাশে দাঁত। ওটা পালের গোদা। আর ঐটে হল তিমি। চমৎকার লেজটা।'

ছেলেটা চেয়ে দেখল পাইলট হাসছে। দেখে সে চুপ করে গেল। ভারি তার লজ্জা হল যে বয়স্ক এক লোক, তাতে আবার পাইলট, তাকে কিনা সে কী সব মেঘে-গড়া হাতী, তিমির কথা শোনাচ্ছে।

আবার জানলায় চোখ রাখলে সে।

পাইলট তার কাঁধে নাড়া দিল।

'সাবাস তোর কল্পনা। সত্যিই মেঘগুলো একেবারে হাতীর মতো! চমৎকার ধরেছিস।'

'মস্কোয় মা আমায় রঙ কিনে দেবে, সত্যিকারের শিল্পীরা যে সব রঙ দিয়ে আঁকে, আমিও আঁকব,' বললে ছেলেটা, 'সত্যি বলছি। দেখুন দেখুন মাটিটা — দাবার ঘরের মতো।'

মাটির দিকে তাকিয়ে দেখল পাইলট। কতবার সে উড়েছে, অথচ এসব কিছুই দেখে

নি। একটু যেন ক্ষোভই হল তার: এই ধরনের কত হাতীর পাশ দিয়ে সে কতবার উড়ে গেছে, অথচ কিছুই লক্ষ করে নি। রোগা ছেলেটার দিকে সে চাইলে প্রশংসার দৃষ্টিতে।

আকাশ তার কাছে বরাবরই কেবল একটা কাজের জায়গা। ওড়া চলবে কি চলবে না, কেবল এই দিক থেকেই সে আকাশকে দেখে: নিচু মেঘলাটে—নামার পক্ষে খারাপ; উঁচুতে মেঘ — ওড়ার পক্ষে তোফা; বজ্রগর্ভ মেঘ — বিপদ। তাছাড়া, শত্রুর বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলা থেকে ওঠা মেঘও সে দেখেছে কম নয় — বজ্রমেঘের চেয়েও সেটা বিপজ্জনক।

আর মাটিটা তার কাছে কেবল অবতরণের জায়গা, পরের বার ওড়ার আগে পর্যন্ত যেখানে বিশ্রাম নেওয়া যাবে খানিকটা।

এর পর পাইলটের ডাক পড়ল কেবিনে, চলে গেল সে।

আর কয়েক মিনিট পরেই ছেলেটা দেখল যে সামনের দিক থেকে ছুটে আসছে একটা বিদ্যুৎ ঝলকানো সীসে রঙা মেঘ।

মা ফের এসে বসলেন ছেলের পাশে। যখন তাঁদের কাছ দিয়ে দ্বিতীয় পাইলট যাচ্ছিল, মা জিজ্ঞেস করলেন:

'ভয়ের কিছু নেই? বজ্রভরা মেঘ তো?'

পাইলট বললে, 'মস্কো থেকে জানিয়েছে যে বজ্রমেঘটাকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি উত্তর দিক দিয়ে।'

এর মধ্যে বিমানের ভেতরটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এল। যাত্রীরা একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিল মেঘের দিকে, এগিয়ে আসছে তা বিমানের দিকে। অস্থির হয়ে সবাই কথা কইতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

বিমান বাঁক নিয়ে সরে গেল মেঘটা থেকে। কেবলি ডান দিকে বেঁকতে হচ্ছিল ওটাকে, কেননা মেঘ ঝেঁপে আসছিল দু'দিক থেকে। হঠাৎ অলক্ষ্যে বিমানটা আটকা পড়ে গেল বজ্রের বেষ্টনীতে। অল্প একটু জায়গার মধ্যে পাক খেতে লাগল বিমানটা আর ক্রমেই চেপে আসতে লাগল মেঘ।

ছেলেটার নজরে পড়ল যে সামনের সীট থেকে দুজন লোক উঠে চলে গেল লেজের দিকটায়। সবাই কেন জানি উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওদের। তারপর আরও দু'জন উঠে একই ভাবে চলে গেল পেছনে।

কেবিন থেকে বেরিয়ে এল কম্যাণ্ডার পাইলট। ফাঁকা সীটগুলোর দিকে তাকিয়ে সে জোরে বলে উঠল:

'অনুরোধ করছি, যাত্রীরা এক্ষুণি এসে নিজের নিজের জায়গায় বসুন। ব্যালান্স রাখা বিমানের পক্ষে কঠিন হচ্ছে।' লোকগুলোর ভীরুতায় বিচ্ছিরি লাগছিল তার, বিপদের প্রথম সঙ্কেতেই এরা ছুটে যায় লেজের দিকে, ভাবে যেন তাতে বেঁচে যাবে।

'আপনার হুকুম ঠিক বুঝতে পারছি না,' যারা উঠে গিয়েছিল তাদের একজন বললে, 'যেখানেই বসি না কেন, কী এসে যায়?'

'ও সব কথা রেখে নিজের জায়গায় বসুন,' জবাব দিল পাইলট।

মুখখানা ওর হয়ে উঠেছে ক্রুদ্ধ আর রুক্ষ। নিজের নিজের জায়গায় লোকগুলো না ফেরা পর্যন্ত সে নড়ল না। এই সময়টায় মুহূর্তের জন্যে তার চোখাচোখি হয়েছিল ছেলেটার সঙ্গে। হঠাৎ এবং এমন একটা বিপজ্জনক মুহূর্তের পক্ষে বড়ো বেশি গুরুত্বহীনতায় বৈমানিকের মনে হল, 'আচ্ছা, এই বজ্রমেঘটা দেখতে কিসের মতো?'

ওপরে উঠতে লাগল বিমান। প্রচণ্ড গুঞ্জন করতে লাগল এঞ্জিন, বাতাসের ঝাপটায় থর থর করে কাঁপতে লাগল জয়েণ্টগুলো, প্রায়ই এয়ার-হোলে পড়ছিল বিমানটা, তাহলেও জেদ করে ওপরে উঠতে লাগল: মেঘের ওপরে উঠে পরিষ্কার উঁচু আকাশে থেকে বজ্রপাতটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। পুরনো মডেলের এই বিমানের উঁচুতে ওঠা সহজ ছিল না, কিন্তু পাইলট শেষ পর্যন্ত ওঠাল।

চুপ করে ছিল সমস্ত যাত্রী, অনেকেই জানলার পর্দা টেনে দিলে যাতে ভয়ংকর কালো মেঘটাকে দেখতে না হয়। একলা শুধু ছেলেটাই চেয়ে রইল জানলা দিয়ে। এই উদ্দাম মোহনীয় রূপটা তার ভালো লাগছিল। এই যে ভয়ঙ্কর কৃষ্ণতার ওপর দিয়ে তারা উড়ে চলেছে, বজ্রগর্ভ আকাশের সে কৃষ্ণতা ভেদ করে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

নিচে, বিমানের তলে কেবলি সব ঝলসানি আর গর্জন, তার রেশ এসে পৌঁছচ্ছে বিমানের ভেতরে। ওই মেঘগুলোর তলে কোথায় যেন মস্কো। হঠাৎ বিমানটা নাক নিচু করে তীর বেগে নিচে নামতে লাগল। তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল, পাইলট তাই ঠিক করলে বেগে নিচে নামবে, কেননা বজ্রমেঘের ভেতর দিয়ে উড়ে যাওয়া সম্ভব কেবল চূড়ান্ত গতিবেগে।

পরের মুহূর্তেই কী যেন বিদীর্ণ হতে শুরু করল, চোখ ঝলসে ঘা দিতে লাগল একেবারে জানলায়, মড়মড় করতে লাগল বিমানটা।

এটা চলল মিনিট পাঁচেক, হয়ত আরো কম, তারপর হঠাৎ একেবারে কাছেই দেখা গেল মাটি, কংক্রীট রান-ওয়ের ওপর ছুটতে লাগল বিমান।

প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। যাত্রীরা গাড়ির অপেক্ষা না করেই ছুটল এয়ারপোর্টের দালানটার দিকে। সবচেয়ে শেষে ছুটল পাইলট। লোকগুলোর সঙ্গ ছাড়তে চাইছিল না সে, এই মাত্র এদের সঙ্গেই একটা মহাবিপদ কাটিয়ে এসেছে সে, তাই তক্ষুণি বিদায় নিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না।

'আপনারা এখন কোথায় যাবেন?' ছেলেটার মাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'আমাদের দরকার সিম্ফেরোপোলে যাবার প্লেন। ঘণ্টা দুয়েক পরে ছাড়ার কথা। জানি না ছাড়বে কিনা।'

'ছাড়বে বৈকি,' জবাব দিল পাইলট, 'ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই এই বজ্রমেঘটা কেটে যাবে। তাছাড়া 'তু' বিমানগুলোর পক্ষে নিচু মেঘ ভয়ের কিছু নয়।'

'দুই ঘণ্টা?' জিজ্ঞেস করলে ছেলেটা, 'তাহলে হয়ত রঙ কেনার সময় হবে?'

'কী রকম আবহাওয়া দেখেছিস?' মা বললেন, 'বৃষ্টি পড়ছে, ঠাণ্ডা লাগতে পারে তোর। রঙ কিনব ফেরার পথে।'

কিছুই বললে না ছেলেটা।

'তাহলে, কুশল হোক!' ছেলেটাকে বললে পাইলট, 'পরিচয় হয়ে খুব আনন্দ হল।'

মায়েতে ছেলেতে যখন 'তু-১০৪' বিমানে বসার জন্যে লাইন দিয়েছে, ছেলেটা যখন রঙের কথা ভুলেই গেছে, অধীর হয়ে উঠেছে সিঁড়িতে ওঠার জন্যে, তখন হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল পাইলট। পোষাকটা তার তখনো ভেজা, বদলাবার সময় পায় নি।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে। ছেলেটা বুঝতে পারল না হঠাৎ কোথা থেকে এল পাইলট, কিন্তু টের পেল কিছু একটা ব্যাপার আছে।

'এই নে তোর রঙ। পুরো সেট। লাল, নীল, গোলাপী — সবই আছে।' একটা লম্বা কাঠের বাক্স এগিয়ে দিল পাইলট, 'নে, নে, ছবি আঁকিস!'

ভয়ে ভয়ে বাক্সটা নিল ছেলেটা, চেয়ে দেখল মায়ের দিকে। যারা লাইনে দাঁড়িয়েছিল তারাও চেয়ে দেখলে।

'কেন অত কষ্ট করতে গেলেন,' বলে টাকা বার করলেন মা, 'অমন হয়রানির পর...'

'কথা যখন দিয়েছেন, তখন দিতে হবে...' বলে চুপ করে গেল বৈমানিক।

মুখটা তার ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠল একেবারে বিমর্ষ আর রুক্ষ। আনাড়ীর মতো টাকাটা নিয়ে পকেটে গুঁজল।

তারপর কেমন কুঁজো হয়ে ঢ্যাঙা দেহে ফিরে গেল এয়ারপোর্টে। চলে গেল পাইলট আর রঙের বাক্সটা বুকে চেপে প্লেনে উঠল ছেলেটা, এবার একশ দশ মিনিটে সে পাড়ি দেবে হাজার কিলোমিটার পথ, জানবে উঁচু কী জিনিস, আধুনিক গতি কী ব্যাপার। আর ওপর থেকে তাকিয়ে দেখবে মাটি, দেখবে তাকে কিছু একটা নতুন দৃষ্টিতে।

ভ্লাদিস্লাভ ক্রাপিভিন

বৃষ্টি আর নক্ষত্র
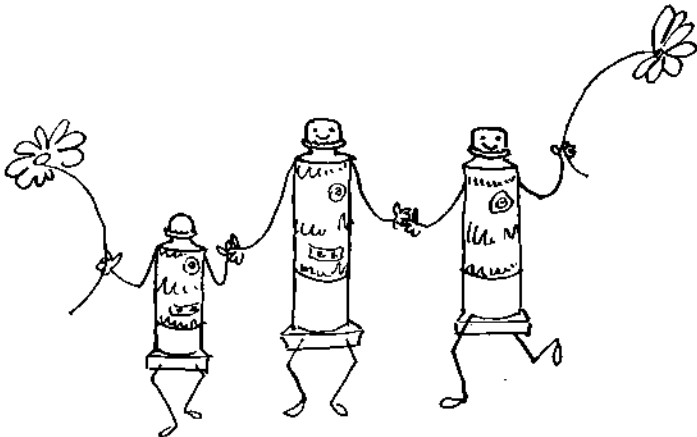
বৃষ্টি চলছিল অনেকক্ষণ।

কালো পিচের ওপর আলোর হলদে ছোপগুলো যেন কড়াইয়ের ওপর ডিমের কুসুম।

গাছপালা, ঘরবাড়ি, রেলিঙ, খবরের কাগজের কিওস্ক আর ছোট্ট স্কোয়ারটার গেটের সামনে প্লাস্টার অব প্যারিসের হর্ণবাজিয়ে মূর্তিগুলো এমন আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আগেই ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গেছে তারা, এখন আর কিছুতেই এসে যায় না। তাই সবাই নিজের নিজের কাজ করে চলল: শাখা দুলিয়ে চলল গাছেরা, মস্কো থেকে আসা সার্কাসের ভেজা পোস্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রেলিঙ, বাড়িগুলো তাদের সদর দরজা খোলে আর বন্ধ করে, নানা রঙের আলোয় ঝলমল করে চলল জানলাগুলো, আর হর্ণবাজিয়েরা শিঙায় মুখ দিয়ে তৈরি হয়েই থাকল, দরকার পড়লে ভোঁ দেবে।

শুধু পত্রিকার কিওস্কগুলো কিছুই করলে না। আগেই সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন শুধু ক্ষুণ্ণভাবে আবছা ঝলক দিচ্ছে তাদের কাচগুলো।

ট্র্যামগাড়িগুলো কিন্তু খুশিই হল বৃষ্টিতে। ভেজা ভেজা ওয়াগনের লাল গাগুলো এমন ঝকঝক করছিল যেন সদ্য তৈরি হয়ে এসেছে কারখানা থেকে। শহরে তারা ছুটছিল যেন বেশি সবেগে, সোল্লাস ঘণ্টি দিচ্ছিল আর তারের প্রতিটি জোড়ের কাছেই ছিটোচ্ছিল সবজে সবজে ভেজা ফুলকি। ঠিক ফুলকি নয়, সবুজ আগুনের ফালি; ছিটিয়ে পড়ছিল তা ট্রামের ভেজা ছাদে, চিড়বিড় করছিল চকচকে পিচের ওপর।

হর্ণবাজিয়ে প্রহরীওয়ালা ছোট স্কোয়ারটিতে এল তিন ওয়াগনের এক ট্রামগাড়ি। অল্প যাত্রী, শেষ ওয়াগনের কণ্ডাক্টর মেয়েটি বুকে থুতনি ঠেকিয়ে ঝিমচ্ছিল। ভারি পাকা কণ্ডাক্টর সে, ঝিমলেও মুখখানার চেহারা কড়া। দূর থেকে মনে হয় যেন নিতান্ত বুকের ওপর ঝুলন্ত নীল টিকিটের বাণ্ডিল আর ঝকঝকে বোল্টওয়ালা ব্যাগটার দিকে চেয়ে আছে।

গাড়িতে একটা ছেলে ঢুকতেই সজাগ হয়ে উঠল সে।

'টিকিট নিয়ে যা, জলদি...'

ছেলেটা তার কুর্তার পকেটে হাত ঢুকাল। তারপর প্যাণ্টের পকেট খোঁজাখুঁজি করলে। কিন্তু তিনটে কোপেক না পেয়ে চুপচাপ নেমে পড়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

'দাঁড়া, বলছি।'

এখন একেবারেই ঘুম কেটে গেছে কণ্ডাক্টরের। ছেলেটার দিকে চেয়ে সে বেশ বুঝলে যে ছেলেটা নিশ্চয় বৃষ্টিতে অনেক হেঁটেছে। সপসপ করছে মাথার চুল, ঘাড়ে সেঁটে গেছে পাট হয়ে। বিন্দু বিন্দু জল গড়িয়ে আসছে তা থেকে, জলে ফেঁপে ওঠা কোর্তাটার কলার বেয়ে নেমে যাচ্ছে। জুতোজোড়াও ছপছপ করছে নিশ্চয়।

'দাঁড়া বলছি,' চেঁচিয়ে ডাকলে কণ্ডাক্টর, 'বড়ো যে রাগ দেখছি... এমন রাতে যাবি কোথায়?'

'সার্কাস পর্যন্ত,' বলে ফিরল ছেলেটি। কিছুতেই তার আর এসে যায় না। গাড়ি সার্কাস পর্যন্ত যায় কিনা তাও সে জানে না সঠিক।

কন্ডাক্টর মেয়েটি টিকিট ছিঁড়ে দিল একটা।

'নে, টিকিট চেকার আসতে পারে...'

ভেজা আঙুলে টিকিট নিল ছেলেটা। ধন্যবাদটুকুও দিলে না। বোধহয় মনে ছিল না। হয়ত বা ইচ্ছে করেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে সে তাকিয়ে রইল জানলার ওপারে বৃষ্টির দিকে। বৃষ্টিতে তার ভয় নেই, ট্র্যামে উঠেছে কেবল বাড়ি থেকে বহু দূরে চলে যাবার জন্যে।

কিন্তু কোথায়? যেখানেই হোক। অভিমান হয়েছে তার।

নড়ে উঠে চলতে লাগল গাড়িটা।

ফের মনে হতে লাগল যেন কন্ডাক্টর মেয়েটি তার নীল টিকিটের বান্ডিল ভরা ব্যাগটার দিকে চেয়ে আছে।

কাঁপা কাঁপা আলোয় জ্বলছে ট্র্যামের বাতিগুলো। বৃষ্টির সময় সর্বদাই একটু ক্ষীণ লাগে বাতিগুলোকে। জানলার ভেজা শার্সিতে দোকানগুলোর বিজ্ঞাপনের লাল সবুজ হরফের ঝাপসা ছোপ। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু রঙচঙে ছোপের দিকে ছেলেটার মন ছিল না। আগের মতোই চোখ কুঁচকে ঠোঁটের পাশদুটো চেপে সে তাকিয়ে রইল। ভাবছিল অন্য কিছু।

তারপর খিদে পেল তার। টের পেল যে ভারি ক্লান্ত হয়ে গেছে। মনের মধ্যে অভিমান থাকলে লোকে চট করেই হাঁপিয়ে যায়। ভিজে জবজবে কুর্তাটার চেয়ে শতগুণ জোরে সে ক্ষোভ তার কাঁধ চেপে ধরেছে। কুর্তা তো ইচ্ছে করলেই খুলে মুচড়ে জল বার করে নেওয়া যায়। কিন্তু ক্ষোভ?

ছেলেটা ঠিক করল কোথাও যাবে। যতক্ষণ ট্র্যাম চলছে, ততক্ষণ স্রেফ বসে থাকবে, যেখানে হোক যাবে।

ওয়াগনে খালি সীট অনেক, কিন্তু বয়স্ক লোকদের পাশে বসার ইচ্ছে হল না তার। রাগতভাবে তারা ঠোঁট বাঁকাবে, ভুরু কুঁচকে ভেজা জবজবে ছেলেটার কাছ থেকে সরে বসবে।

জানলার কাছের একটা বেঞ্চে বসেছিল একটি মেয়ে।

রগের কাছে ওর সোনালী চুলের ঢেউটা চোখে পড়ল তার, ছোটো ছোটো বেণীদুটো, তার ডগাগুলো আবাঁধা, কাঁধে ফেলা হুডটা, যার ওপর কালো কালো বৃষ্টির ফোঁটা।

ছেলেটা এগিয়ে গেল বেঞ্চিটার কাছে, তারপর ভুরু কুঁচকেই তাকাল মেয়েটির দিকে। মেয়েটাও যেন তার অনাহূত ভেজা পড়শীটিকে দেখবার জন্যেই মুখ ফেরালে জানলা থেকে। ছেলেটা প্রায় বলে উঠতে যাচ্ছিল, আরে তুই যে!

মেয়েটা তার চেনা।

অবিশ্যি তেমন চেনা নয়। ছেলেটি ওকে চেনে, কিন্তু মেয়েটি তাকে নিশ্চয় জানে না।

শরত, শীত আর বসন্তে ও প্রায় প্রত্যেক দিনই ওকে দেখেছে।

ও পড়ে একুশ নম্বর ইশকুলে, আর মেয়েটি মনে হয় বত্রিশ নম্বরে। আর নিশ্চয় ওই ষষ্ঠ শ্রেণীতেই। অন্তত ক্লাস ওদের শেষ হত প্রায় একই সময়। ছেলেটি বাড়ি ফিরত সাদোভায়া রাস্তা দিয়ে, মেয়েটি চেখভ রাস্তা ধরে। পয়লা মে রাস্তায় দেখা হত মুখোমুখি।

প্রথমটা ছেলেটা তেমন মন দেয় নি। সাধারণ মেয়ে। তাকে মনে রাখার কারণ এই যে প্রায়ই দেখা হত। তাছাড়া হয়ত এইজন্যে যে, ওর মাথায় থাকত একটা কালো ফার টুপি, ঠিক কুঁকড়ে যাওয়া বেড়ালের মতো দেখতে। তাছাড়া, মেয়েটা যখন তাড়াতাড়ি করে হাঁটত তখন তার ঢোলা টুপিটা নেমে আসত কপালের ওপর, ভারি মজা লাগত দেখে। আর হাঁটত মেয়েটা প্রায় সর্বদাই তাড়াতাড়ি করে। একটু সামনে ঝুঁকে অধৈর্যে সঙ্গিনীর দিকে তাকাতে তাকাতে এগুত। কোথায় যাবার জন্যে অত তাড়া? টুপির তল থেকে ছোটো ছোটো সোনালী কুন্ডলীতে ঝুলন্ত চুলগুলো লম্বা লম্বা কালো ফারের সঙ্গে জড়িয়ে যেত। মোটের ওপর, একেবারেই সাধারণ একটা মেয়ে। নেহাৎ স্কুল থেকে ফেরার পথে ওকে দেখার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল ছেলেটার—যেমন অভ্যেস হয়ে গেছে মোড়ের মাথায় কাচের চৌকিতে বসা ট্র্যাফিকের মিলিশিয়া, কি কৃষিবিদ্যা স্কুলের মাথার বড়ো ঘড়িটা দেখতে। তবে, হয়ত ঠিক তা নয়... অন্তত ঘড়িটা যখন খুলে নেওয়া হল তখন তার কোনোই অস্বস্তি লাগে নি, অথচ পয়লা মে রাস্তায় যখন পুরো এক সপ্তাহ মেয়েটার দেখা পেল না, তখন কেমন একটা দুশ্চিন্তা হয়েছিল তার। পরে ফের যখন দেখা হল, কেমন যেন ভালো লাগল। আর তখন কেমন রাগও হয়ে যায় ওর, লাল হয়ে ওঠে, পাশে পাশে যাচ্ছিল সেরেগা দেরিয়াবিন, আড়চোখে চেয়ে দেখে তার দিকে। প্রতিজ্ঞা করে আর কখনো মেয়েটার দিকে তাকাবে না। পথের একটা মেয়ের দিকে চোখ তুলতে বড়ো তার বয়ে গেছে!

তবে মানুষের মন ভারি বিদঘুটে। এই একটা প্রতিজ্ঞা করলে, পরমুহূর্তেই ঠিক উল্টোটা করতে ইচ্ছে হয়।

তারপর একবার মার্চ মাসের শেষের দিকে, সত্যিকারের বসন্ত যখন শুরু হয়ে গেছে, তখন একদিন দক্ষিণপশ্চিম কোণ থেকে জোর হাওয়া উঠে ছাই রঙের মেঘে আকাশ ঢেকে গেল, চ্যাটচেটে বরফ পড়তে শুরু করলে। পড়তেই থাকল, পড়তেই থাকল, বাঁকিয়ে রাখল পপলার গাছগুলোকে, ঢেকে ফেললে জল-জমা কালো কালো জায়গা, লটকে গেল বিজলী তারগুলোয়। আপনা থেকেই যেন এসে পড়তে লাগল হাতের তালুতে, হাতের তালুও তা পাকিয়ে তুলতে লাগল তুষার গোলায়।

'হুঁশিয়ার!' স্কুল থেকে বেরিয়ে বললে সেরেগা, 'সোজা শত্রুর দিকে!'

কালো টুপি পরা শত্রুটি আসছিল সামনে থেকে। বরাবরের মতোই তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছে, কী চক্রান্ত পাকিয়ে উঠেছে জানে না।

বরফ নেবার জন্যে নিচু হল সেরেগা। ছেলেটাও নিচু হল। গুলি পাকিয়ে সোজা ওর ঝাঁকড়া-লোমো টুপিটায়! তখন টের পাবে... সেরেগা তার বাঁ চোখটা কুঁচকে বরফের গোলা পাকানো হাতটা পিঠের দিকে লুকোল। হাতের টিপ ওর নিখুঁত, চোখও নিখুঁত। কিন্তু কী যেন হল। মুহূর্তে খাড়া হয়ে উঠল ছেলেটা আর যেন দৈবাৎ আড়াল করে বসল মেয়েটিকে। বরফের গুলিটা লাগল তারই মুখে।

বরফ-মাখা মুখে সেরেগার দিকে ফিরে দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে:

'দেখে ছুঁড়তে হয়...'

বিমর্ষ, বিব্রত সেরেগা কিছুই বললে না। কে জানত এমন হবে।

গ্রীষ্ম এল। মেয়েটার সঙ্গে ছেলেটার আর দেখা হত না পথে। তারপর ভুলে গেল।

এখন কিন্তু তাকে দেখেই চিনল সে, যদিও ঝাঁকড়া লোমো বেড়ালের মতো দেখতে সেই টুপিটা তার মাথায় ছিল না।

পাশেই বসল ছেলেটা। সাবধানে বসতে গিয়েও মেয়েটার হাঁটুর ওপর রাখা ছাতাখানা পায়ে লেগে গেল। ভুরু কুঁচকে ঘুরে বসতেই তার ভেজা আস্তিনে ঘসে গেল মেয়েটার রেনকোটটা।

'ভয় নেই, ওটা জলে ভেজে না,' বললে মেয়েটি, কেননা ছেলেটা ত্রস্ত হয়ে কনুই টেনে সরে বসছিল একেবারে শেষ প্রান্তে।

'ভয় কেউ পাচ্ছে না,' বিড়বিড় করে বলে সে ট্র্যামের মেজেটার দিকে তাকিয়ে রইল।

মেজেটা জালিকাঠে বাঁধানো, ভেজা ভেজা টিকিট লেগে আছে তাতে।

'ছাতা না থাকলে মুশকিল,' আস্তে করে বললে মেয়েটি।

গলার স্বরে তার কোনো মেয়েলী অনুকম্পা ছিল না। ছিল শুধু একটু সহানুভূতি। ছেলেটা কী ভেবে জবাব দিলে:

'তা মুশকিল বৈকি!'

'কিন্তু বৃষ্টি ঝাঁপাচ্ছে যে।'

ওটা না বললেও চলে। বোঝাই যাচ্ছে যে মেয়েটার আলাপ করার ইচ্ছে হচ্ছে। তাছাড়া বৃষ্টি আবার ঝাঁপাচ্ছে কোথায়? গুঁড়িগুঁড়ি পড়ছে। ছেলেটা বলে দিলে:

'ওহ, 'ঝাঁপাচ্ছে'!.. বাজে বকিস না।'

'আমি বাজে বকছি?' রাগ হল মেয়েটার, 'তা বাজেই বকছি। আকাশে মেঘ নেই, রাস্তাঘাট খটখটে। তুইও একেবারে শুকনো।'

'তোর আর ভাবনা কী!' রেগে ঠাট্টা করলে ছেলেটা, 'গায়ে রেনকোট, তার ওপর আবার ছাতা, গায়ে ফোঁটাটি লাগবে না।'

'হ্যাঁ, আমার ভাবনা নেই,' সঙ্গে সঙ্গেই সায় দিয়ে কেন জানি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে মেয়েটা। তার পর বলল, 'ছাতাটা আমার নয়, মায়ের। ওই যে সামনে বসে আছে... তা তুই কেন ছাতা নিয়ে বেরস নি?'

'ছাতা আমার নেই,' স্পষ্ট করে বললে ছেলেটা, 'থাকলে ঘরেই বসে থাকতাম, সেই তো হয়েছে ব্যাপার।'

মেয়েটাকে অবাক হতে দেখে তার তৃপ্তিই হল।

'বিনা ছাতায় বৃষ্টিতে ঘুরিস, আর ছাতা থাকলে... ঘরে বসে থাকিস?'

'হ্যাঁ,' বললে ছেলেটা। ঠোঁট চেপে ভুরু কোঁচকাল, 'কেন, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?'

'তুই এমনিতেই কী যেন...' একটু আহতভাবে বললে মেয়েটা।

'কী?' গোমড়া মুখেই জিজ্ঞেস করলে সে, তারপর যোগ দিলে, 'তা আমার দোষ কী? যখন ঘটে গেল...'

'কী ঘটল?'

কথাটা মেয়েটা বলেছিল খুব নির্বিকারভাবে। যেন নেহাত ভদ্রতার খাতিরে। কিন্তু ছেলেটা লক্ষ করলে যে সে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

ভুরু কোঁচকানো বন্ধ করলে সে।

যতই হোক মেয়েটা তো খানিকটা চেনাই, তার সঙ্গে আলাপও করেছে চেনা লোকের মতো। বরফের গোলার হাত থেকে তাকে সে একদিন স্রেফ বাঁচিয়েও দিয়েছে। তেমন নরম গোলা নয়। মেয়েটা অবিশ্যি তা জানে না, কিন্তু এক দিক থেকে সেটা বরং ভালোই, ভাবলে ছেলেটা। নিজের ব্যর্থতার ঘটনাটা তাকে বলার ইচ্ছে হল ছেলেটার। সবচেয়ে শক্তিমান গর্বিত লোকেরাও তো মাঝে মাঝে নিজের দুঃখের কথা কাউকে শোনাতে চায়। বুকের ভার কমে তাতে।

'কী জানিস...' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছেলেটা তার নেতিয়ে পড়া জুতোজোড়া নাড়াল। 'কী জানিস,' এবার মন স্থির করেই বললে, 'আমি একটা আবিষ্কার করেছি।'

ও বলতে চেয়েছিল 'বানিয়েছি,' কিন্তু ঠিক মুখ দিয়ে বেরল না। 'আবিষ্কার' কথাটাই এসে গেল জিভের ডগায়। কে জানে হয়ত এইটেই বেশি ঠিক...

ওর কাছে এটা সত্যিই আবিষ্কার। ব্যাপারটা ঘটে তিন দিন আগে। তখন বৃষ্টি শুরু হয় নি, ঝলমল করছে রোদ্দুর। একটা গুদাম ঘরের চালের ওপর ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল সে।

'লাফা!' নিচ থেকে ছেলেরা চ্যাঁচাল।

ছেলেটা কিন্তু লাফাল না।

'ভড়কে গেছে,' টিপ্পনি কাটলে সবচেয়ে ছোটো ও মোটা ছেলেটা, অবজ্ঞায় ঠোঁট বাঁকাল।

তবুও চুপ করে রইল ছেলেটা।

মাটি থেকে গুদামটা দেখতে খুবই সাধারণ, পুরনো, উঁচুও বেশি নয়। চালার নিচু প্রান্তটা পর্যন্ত মাত্র তিন মিটার। ছেলেটাও সাধারণ ছেলে। তেমন লম্বাটে নয়, সরু সরু হাত, রঙ-জ্বলা চুল, ছাঁট দেবার সময় হয়ে এসেছে। আগস্ট মাসের সব ছেলেমেয়েদের মতোই রোদ-পোড়া রঙ। গায়ে একটা নীল ফতুয়া, বেল্ট থেকে তা বেরিয়ে এসেছে। মোটেই বীরের মতো নয়। তবে এতদিন পর্যন্ত কোনো কাপুরুষতাও তো সে দেখায় নি।

অথচ এখন দাঁড়িয়েই আছে, লাফ দিচ্ছে না।

'উঠে গিয়ে একটা থাপ্পড় কষতে হয়!' প্রস্তাব দিলে রোগা শণ-চুলো একটা মেয়ে—সেই ধরনের মেয়ে, সমস্ত বিপজ্জনক ব্যাপারে যে ছেলেদের সঙ্গে থাকে, 'তোকে বলছি, নে লাফা! নয়ত পেটে ভর দিয়ে নেমে যা, অন্যদের আটকে রাখিস না।'

জবাব দিল না ছেলেটা।

আকাশে মেঘ ভেসে যাচ্ছে, বড়ো বড়ো, গোল গোল, যেন হলদে এয়ারোস্ট্যাট। আর মাটি থেকে যে গুদামটাকে মনে হয় নিতান্ত সাধারণ, সেটা যেন ভেসে যাচ্ছে মেঘগুলোর দিকে, যেন আকাশে ওঠা একটা জাহাজ।

আর আঙিনাটাকে মনে হয় মহাকাশ থেকে দেখা পৃথিবীর পিঠ। গোল গোল শাদা ড্যান্ডেলিয়ন ফোটা ধুলোটে ঘাসের চাপড়াগুলো যেন সবুজ দ্বীপপুঞ্জ আর গুদামঘরটার কাছে যে পিপেটায় বৃষ্টির জল জমে আছে, সেটা যেন একটা গোল হ্রদ, গভীর নীলে জমজম করছে।

দুনিয়ার সবকিছুকেই ছেলেটা এক একটা নাম দিতে ভালোবাসত। চট করে নামগুলো মনে এসে যেত তার। পিপের চকচকে জলটার সে নাম দিলে নীল রঙা হ্রদ, আর ঘাসের চাপড়াগুলোকে অজানা বনের দ্বীপপুঞ্জ...

'কই, ঝাঁপা!' প্রাণপণে চিৎকার করলে শণ-চুলো মেয়েটা।

শেষ পর্যন্ত সজাগ হল ছেলেটা, হ্যাঁ, এবার ঝাঁপ দিতে হয়।

এবং ছাতাটা তুলল।

কালো ছাতাটা ঠিক যেন এক সার্কাসের গম্বুজ। শুধু শতগুণ ছোটো। গম্বুজের তলে সর্বদাই আলো জ্বলে, এখানে কিন্তু সবই কালো। জ্বলছে শুধু একক একটি ফুটো, সূচ ফুটানো ছ্যাঁদার মতো। তাতে আকাশের আণুবীক্ষণিক একটা বিন্দু এমনভাবে জ্বলছে যেন অন্ধকার আকাশে নীলচে তারা।

'নীল লুব্ধক তারা,' ফিস ফিস করে বললে ছেলেটা, বুকের মধ্যে তার এমন একটা অনুভূতি নাড়া দিয়ে উঠল যা প্রায় আনন্দের মতো।

ছাতাটা সে একেবারে নিচে নামিয়ে আনল, মাথার চুলগুলো ঠেকল ছাতার কাপড়ে।

এবার ছেলেটা দেখতে পাচ্ছে কেবল পৃথিবী আর আকাশের বদলে শুধু একটা রোদে গরম কালো কাপড়। কেন জানি আটার গন্ধ বেরচ্ছে তা থেকে। শুধু সেই নাক্ষত্রিক ফুটোটায় আগের মতোই জ্বলজ্বল করছে এক বিন্দু নীল। তারপর সেটা ঘুরল সূর্যের দিকে। চোখ ধাঁধানো আগুনে জ্বলে উঠল তারাটা, ছড়িয়ে পড়ল সূক্ষ্ম কিরণ আর সাত রঙা চক্রে।

'তারার বিস্ফোরণ,' ফিসফিস করলে ছেলেটা।

'ওরে মন্ত্র জপছে রে, বলছে 'ভগবান বাঁচাও'!' নিচে থেকে সজোরে চ্যাঁচাল সেই রোগা মেয়েটা, রাগে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

'হুঃ, বলে আবার নক্ষত্র মানচিত্র নাকি ওর মুখস্থ! ফলটা কী?' বললে ওদের সবার চেয়ে বড়ো আর বিচক্ষণ ছেলেটা, 'তিন মিটারও লাফাতে পারে না। অমন মহাকাশচারী আমরা ঢের দেখেছি।'

'কী?' ওপর থেকে জিজ্ঞেস করল ছেলেটা। এতক্ষণে সে টের পেল যে ওরা ভাবছে সে ভয় পেয়েছে!

ধীরে সুস্থে ছাতাটা বন্ধ করলে সে। ওটা এখন জমিয়ে রাখা দরকার।

'আমি এমনিতেই লাফাতে পারি!'

প্যারাশুট-রূপী ছাতাটা ছাড়াই সে ঝাঁপ দিল। কাঠের স্তূপটা ডিঙিয়ে হাতে পায়ে ভর দিয়ে সে নামল ঘাসগুলোর ওপর একেবারে অজানা বনের দ্বীপপুঞ্জে...

'বড়ো দেখালেন...' বললে শণ-চুলো রোগা মেয়েটা। কিছু বলবার না থাকলে এই কথাটা বলাই মেয়েদের অভ্যেস।

সবচেয়ে ছোটো ও মোটা ছেলেটা তার মোটা মোটা ঠোঁট কামড়ালে।

'ভেবেছিস আর কেউ পারে না?' বলে নড়বড়ে কাঠের স্তূপটা বেয়ে সে চালায় উঠতে লাগল।

ছেলেটা জবাব দিলে না। ছাতা খুলে আবার ফুটোটা পাতল রোদে। কাপড়ের আকাশে ফুটল তারা। ছেলেটা চোখ টিপে আস্তে করে হাসল।

এইভাবেই ঘটল আবিষ্কারটা।

...মেয়েটাকে অবশ্য এত কথা সে বলতে পারে নি। অনেক সময় যেত, ঠিক বুঝত না। সে শুধু বললে:

'আমি একটা প্ল্যানেটারিয়ম বানাতে চাইছিলাম। ছোট্ট প্ল্যানেটারিয়ম, বয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে। দরকার শুধু ছাতাতে সমস্ত নক্ষত্রগুলোকে জায়গা মতো বসানো। বুঝেছিস তো? ছাতা খুললেই দেখা যাবে সব নক্ষত্র। সুঁই দিয়ে সব জায়গা মতো ফুটো করে দিলেই হল: দিনেও দেখা যাবে কোথায় কোন নক্ষত্রটা। দরকার কেবল আগে থেকে মাপজোখ করে ঠিক করে নেওয়া ছাতাটা কীভাবে রাখতে হবে।

'সব নক্ষত্র তুই চিনিস? জানিস কোনটা কোথায়?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।
'হ্যাঁ, রাতে আমি মিলিয়ে দেখেছি...'

ঘাস, নদীর কুয়াসা আর ঠান্ডা হয়ে আসা ফুটপাথের গন্ধে রাতটা ভরা।

অলিন্দ থেকে নেমে এল ছেলেটা। আলো নেভা জানলাগুলো মিটমিট করছে তিনটে তলা জুড়ে। দিনের গরমে দেয়ালগুলো এখনো গরম। বাড়িটা যেন কোনো গরম দেশ থেকে আসা এক মস্ত জাহাজ, নিজেদের চেনা জেটিতে ভিড়েছে। আর আঙিনার অনেকটা দূরে পুরনো গুদামটা যেন এক অন্ধকার পাহাড়।

ছেলেটা আঙিনা পেরিয়ে গুদামটার ওপর উঠল।

এখন সবকিছুই অন্যরকম। ঘাসের চাপড়ার দ্বীপগুলো অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। পিপেটায় জমা বৃষ্টির জলটাকে মোটেই হ্রদ বলে মনে হয় না। এখন সেটা একেবারে কালো, তাতে নিশ্চল দুটো তারার প্রতিফলন। মনে হয় যেন পৃথিবীটা এপাশ ওপাশ ফুটো হয়ে গেছে, আর সেই সুরঙ্গ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওপাশের দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে তারা।

ছেলেটার ফতুয়ার তলে টিক টিক করছে একটা অ্যালার্ম ঘড়ি। ভয়ে দুরু দুরু করছে বুকের তলায় লুকনো কোনো পাখির হৃৎপিন্ডের মতো। ঘড়িটা বুঝতে পারছে না কেন ওকে আয়েসী টেবিলটা থেকে তুলে এনে ঢোকানো হল পেট আর গেঞ্জির ফাঁকে, তারপর নিয়ে আসা হল কে জানে কোথায়। কামরার ছোট্ট ঘড়িটা আন্দাজই করতে পারে নি যে তাকে বৈজ্ঞানিক ক্রনোমিটারের কাজ করতে হবে।

ঘড়িটা বার করে ছেলেটা কাছেই একটা তক্তার ওপর রাখল। ছাড়া পেতেই শান্ত হয়ে গেল ঘড়িটা, কাজের লোকের মতো ঠিক ঘরোয়া সুরেই টিক টিক করতে লাগল।

স্যাঁৎসেঁতে হয়ে উঠল কেমন। জোরালো না হলেও বেশ ঠান্ডা একটা ঝাপটা দিলে মুহূর্তের জন্যে। ছেলেটা হাত দিয়ে কাঁধবুক চাপলে। ঘড়িতে দেখা গেল বারোটা বাজতে তখনো দশ মিনিট বাকি।

আকাশের দিকে চাইল ছেলেটা।

সে আকাশ এতই অসীম যে নিঃশ্বাস নিতেও ভয় হয়।

কালো আকাশে সিক্ত আভায় তারা জ্বলছে। উত্তর গোলার্ধের নক্ষত্র মানচিত্র ছেলেটার ভালোই জানা ছিল। এমন কি বই না দেখেই সে এটা এ'কে দিতে পারে। তবে, তার মনে আছে কেবল প্রধান প্রধান জ্বলজ্বলে তারাগুলোর কথা। যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে নক্ষত্রমন্ডলীগুলোর আঁকাবাঁকা আকার। কিন্তু এখন যেন ছেলেটাকে সাহায্য করবে ভেবে আকাশ তার নক্ষত্রের সমস্ত ভান্ডার উজাড় করে দিয়েছে।

যতই সে দেখতে লাগল ততই যেন সীমাহীন কালোর মধ্যে কেবলি ফুটে উঠতে লাগল তারা। সবচেয়ে কাছের জবলজবলে তারাগ্লোর পরেই যাদের দেখা গেল, তারা অতটা জবলন্ত নয়, তবে সংখ্যায় অনেক। তাদের পর মিটমিট করছে বহ্দ্রের তারাগ্লো। কিন্তু তাই সব নয়। ভালো করে নজর করে ছেলেটা দেখল যে আকাশ তারার মিহি ধ্লোয় একেবারে ভরা। সে ধ্লো ঘন হয়ে এসেছে ছায়াপথের আবছা পোঁচগ্লোর কাছে।

ঘাবড়ে গেল ছেলেটা। এত সব তারার কথা সে জানত না। মানচিত্রে ওরা নেই।

এ আকাশ আঁকা অসম্ভব...

তবে তারপর সে জোর করে নিজেকে শান্ত করল। সে ভাবল, তার দরকার শ্ধ্ প্রধান প্রধান তারাগ্লো। যেগ্লো দিয়ে গড়ে উঠেছে সপ্তর্ষিমণ্ডল, শিশ্মার। অন্তত প্রথম দিকটায়... এই সব তারাগ্লোর জন্যেই তো রাতের আকাশটা তার কাছে চেনা মনে হচ্ছে। ওরা যেন সেই বড়ো বড়ো দ্বীপ যা দিয়ে দ্বীপপ্ঞ্জকে চেনে নাবিকেরা...

এই সে ভাবল বটে, তবে কেবলি নতুন নতুন জ্যোতিষ্ক খ্ঁজে চলল সে। তাদের প্রত্যেকটাতেই মিটমিট করছে রহস্য।

মন্থর বাতাস বইল, ভেজা-ভেজা, কনকনে। মনে হল যেন মহাজাগতিক শৈত্য ভারি ভারি ফোঁটায় পড়ে প্থিবীর গরম বাতাসে একটা সিক্ত তাজা আমেজ গড়ে দিচ্ছে। কেঁপে উঠল ছেলেটা। কিন্তু আকাশের তুহিন নিঃশ্বাস যে তার কাছে সম্দ্রপাড়ির পালের হাওয়া। এই সময় একটা তীক্ষ্ম ঝনঝন শব্দে নীরবতা ছিঁড়ে গেল। অ্যালার্মের বোতামটা টিপে বন্ধ করে দিলে ছেলেটা। মধ্যরাত্রি এসে গেছে।

প্রথমে ধ্রব তারাটা খ্ঁজল সে, তারপর চোখ-আন্দাজে একটা সর্ রেখা টেনে গেল উত্তরে, একেবারে অন্ধকার দিগন্ত পর্যন্ত। তারপর দক্ষিণে, প্রে, পশ্চিমে।

জ্যোতির্বিদ্যায় ছেলেটা অবিশ্যি খ্ব পাকা ছিল বলা যায় না, তবে কিছ্ কিছ্ তো জানত। হিশেবটাও তার সহজ। আকাশ ঘোরে ধ্রব তারাকে কেন্দ্র করে, ২৪ ঘণ্টায় তার এক পাক প্র্ণ হয়। প্থিবী থেকে তাই মনে হয়, তার মানে এক ঘণ্টায় তারাগ্লো পেরবে ব্ত্তের ২৪ ভাগের এক ভাগ। তাই দিন রাতের যে কোন সময় কোন তারাটা কোথায় থাকবে তা বলে দেওয়া যায়। তার জন্যে শ্ধ্ আগে জানা দরকার ঠিক রাত বারোটায় তারা কোন্‌টা কোথায় ছিল। ছেলেটা এখন তা জেনেছে।

নক্ষত্রমণ্ডলীরা এখন তার কাছে বন্দী...

'সব মিলিয়ে দেখলাম, হিশেব করলাম,' বললে ছেলেটা।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করলে মেয়েটি।

'তারপর?.. সব শেষ। ছাতা তো আমার নেই।'

ছাতা ছিল। সেই ছাতাটা, যা নিয়ে ছাদ থেকে সে লাফাতে গিয়েছিল। আলমারির পেছনে ওটা গড়াত, কেননা বাদলার সময় ছেলেটার মা-বাপে রেনকোট ব্যবহার করত। ছেলেটাও তাই ছাতাটাকে নিজের সম্পত্তি করে নিয়েছিল।

কিন্তু সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। আর সবই ওই শুঁটকে মাগী ভেরোনিকা পাভলোভনার জন্যে। রোজ সন্ধ্যায় সে ঘরে বসে কাটায়, আর আজ, এমন আবহাওয়ায় কিনা ঝোঁক ধরলে স্বামীর বন্ধুদের কাছে যাবে। সেখানে নাকি ওর কী সব কাজ আছে। সে সব বন্ধুদের কাছে নাকি কী সব কাগজপত্র রেখে গেছেন তার স্বামী, সেগুলো নাকি নিয়ে আসতে হবে। জরুরী সব দলিল। শেষ না করা থিসিসটার সঙ্গে ওগুলোর নাকি একটা সম্পর্ক আছে...

'কাল গেলে হয় না, ভেরোনিকা পাভলোভনা?' সাবধানে জিজ্ঞেস করেছিলেন বাবা।

'না,..না, একেবারে না!' বললে ভেরোনিকা পাভলোভনা।

মেয়েটার ছোট্ট থুতনি, ধূসর ঠোঁট, দুঃখু-দুঃখু চোখ, তাতে নীল কাজল। তার ওপর আবার বেদেদের মতো কানে অর্ধচন্দ্র সোনালী মাকড়ি। কেন যে অমন বিদুষী কানে মধ্যযুগের এক জিনিস বয়ে বেড়ায়, সেটা ছেলেটা কিছুতেই বুঝতে পারে না।

বাপকে সে কথা সে জিজ্ঞেস করেছিল।

'তাতে তোর কী! বড়োদের নিয়ে হাসাহাসি করা ছাড়!' ধমক দিয়েছিলেন বাবা।

ভেরোনিকা পাভলোভনা ছেলেটার কাকী। কাকা মারা গেছেন তিন বছর আগে, কিন্তু প্রতি বছর ভেরোনিকা পাভলোভনা তাদের বাড়িতে এসে দু' সপ্তাহ করে কাটিয়ে যেতেন। দিনের বেলায় ঘরগুলোয় একা একা থাকতেন, আর সন্ধেয় স্বামীর বাখানি গাইতেন কী একটা খুঁড়ে তোলা পাণ্ডুলিপি নিয়ে, গবেষণাটা যিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। মরে গেলেন। তাহলেও তিনি ছিলেন পি. এইচ. ডি। তা নিয়ে ভেরোনিকা পাভলোভনার ভারি গর্ব।

কেন জানি মা-বাপে তাঁর সামনে কেমন মুখ কাঁচুমাচু করতেন। হয়ত এইজন্যে যে তাঁরা পি.এইচ.ডি নন, ভূর্জপত্রে লেখা নভগরোদী প্রাচীন পাট্টা নিয়ে গবেষণার কিছু বুঝতেন না।

ভাবতেও হাসি পায়!

ভেরোনিকা পাভলোভনাকে ধরা হত ঘনিষ্ঠা আত্মীয়া বলে, কিন্তু সবাই ওঁকে সম্মান করে সম্বোধন করত। শুধু ছেলেটা তাকে সম্মান করেও ডাকত না। কাকীও বলত না।

'ওঁর সঙ্গে তুই কথা বলিস না কেন?' জিজ্ঞেস করেছিলেন বাবা।

'কী নিয়ে বলব?'

'বড্ডো বখে গেছিস দেখছি,' হুমকি দিলেন বাবা। 'তোকে আমি দেখছি...'

'ওই মাগো!' আস্তে করে বললে ছেলেটা।

ওই ওর অভ্যেস। নিজের ও অভ্যাসটা ওর নিজেরই ভালো লাগত না। ছেলেরাও ওকে মাঝে মাঝে খেপাত: ওই মাগো! একেবারে মেয়ে। কিন্তু অভ্যেসটা ও কিছুতেই ছাড়তে পারে না। 'ওই মাগো' কথাটা সে বলত নানাভাবে: কখনো ঠাট্টা করে, কখনো অবাক হয়ে, কখনো নির্বিকার হাই তুলে, কখনো আরও কত রকমে। কখনো জোরে, কখনো ফিসফিসিয়ে। এবার ও বলেছিল খুবই আস্তে। বাবা শুনতে পান নি।

তাহলেও ভেরোনিকা পাভলোভনার সঙ্গে সে কথা বলে নি। ভেরোনিকা পাভলোভনাও তার দিকে কর্ণপাত করে নি।

কিন্তু আজকে তার মনে ধরে গেল ছাতাটি।

এদিকে জানলার কাছে বসে ছেলেটা সুঁই ফোটাচ্ছিল ছাতায়। কাপড়টা ছিল খাপী, প্রতিটি বিঁধের পর দেখা দিচ্ছিল গোল গোল নিটোল ফুটো। কোনোটা বড়ো, কোনোটা ছোটো। তারাগুলোও তো আর সমান মাপের হয় না...

কিন্তু তারা নিয়ে কি আর সবাই মাথা ঘামায়?

'এটা বর্বরতা,' শুকনো গলায় বলল ভেরোনিকা পাভলোভনা, 'সাবেকী জিনিস নিয়ে এমন করে কেউ!'

ছাতাটা সাবেকী নয়, স্রেফ পুরনো। তাছাড়া বর্বরতাটা কি জিনিস তাও বোঝা গেল না। কিন্তু মা-বাপে ছেলেটার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন পুরো এক সিন্দুক দামী জিনিস সে নষ্ট করেছে।

'দেখেছেন!.. এক, দুই, তিন... আটটা ফুটো করেছে ও,' নিখুঁত হিসাব করল সে। সপ্তর্ষিমণ্ডল হয়ে গেল তার কাছে শুধু ফুটো!

'সাতটা ফুটো,' বললে ছেলেটা, 'একটা আগেই ছিল।'

'তুই থাম তো,' ধমকে উঠলেন বাবা; তাড়াতাড়ি করে ভেরোনিকা পাভলোভনাকে বললেন, 'আমার কাছে আটা-ফিতে আছে, ভেতর থেকে তালি মেরে দেব।'

ভেরোনিকা পাভলোভনা আহতের মতো ঠোঁট বাঁকালেন: পি.এইচ.ডি'র বৌকে কিনা পট্টি দেওয়া ছাতা!

'আমাদের বাড়ি হলে ছেলেমেয়েদের এমন কাণ্ডে নিশ্চয় শাস্তি দিতাম।'

তবে ছেলেমেয়ে ওঁদের ছিল না।

'সে তো বটেই,' সায় দিলেন বাবা।

মিটমিটে মাকড়িদুটো দুলিয়ে ভেরোনিকা পাভলোভনা ঘর ছেড়ে গেলেন।

'লোকের সামনে কেবল আমাদের মাথা হেঁট করাতেই শিখেছ!' বললেন মা, বোঝা গেল না মায়ের অমন হতাশ হবার কী আছে।

'লোকের সামনে আবার কোথায়?' বললে ছেলেটা।

চোখের পাতায় ছেলেটার বড়ো বড়ো রোঁয়া। যখন খোলা মনে, ফুর্তিতে সে চাইত, রোঁয়াগুলো উঠে যেত ওপরে। কিন্তু যখন চোখ কোঁচকাত, তখন একেবারে কাঁটা কাঁটা দেখাত।

বাপ তার আকারে ছোটোখাটো, রেগে গিয়ে এবং সেই কারণে কেমন যেন খোঁচা খোঁচা মুখে আনাড়ীর মতো ঘুসি মারলেন টেবিলে:

'মুখ সামলে! দেখাব তোকে! কী আস্পর্ধা!'

'আস্তে,' মিনতি করলেন মা।

'ছাতাটার ওপর তোমাদের যদি মায়া থাকত, তাও নয় হত।' কান্না ঠেলে আসছিল, টের পাচ্ছিল ছেলেটা, 'ছাতাটা তো তোমরা ফেলে রেখেছিলে। এ সব বলছ শুধু ওঁর ভয়ে...'

'শুয়োর কোথাকার!' সরু গলায় চিৎকার করে উঠলেন বাবা, 'বেরিয়ে যা এক্ষুণি!'

না, জবাবে ছেলেটা চেঁচালেও না, দুয়োরও দড়াম করে বন্ধ করলে না। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল সিঁড়িতে, রেলিঙের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। অভিমানে গলা বন্ধ হয়ে আসছিল, কর কর করছিল চোখ। তখন আস্তে আস্তে নিচে নেমে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে যায় ছেলেটা।

ঠান্ডা লেগে যদি সে মরেও যায়, তাতেও তার কোনো আপত্তি নেই। মানে, ঠিক মরা নয়, ধরা যাক যদি নিউমোনিয়া হয়। তখন সবাই বুঝবে... কিন্তু বৃষ্টিটা দেখা গেল নিষ্ঠুর নয়, ছেলেটাকে সে মারতে চায় না। নিজের তপ্ত ধারায় তাকে আলিঙ্গন করে তার অভিমান ধুয়ে দিতে চাইল। অভিমান কিন্তু ধুয়ে গেল না, একটা জ্বালা-জ্বালা ঘোলাটে জের রয়ে গেল তার। কিন্তু বৃষ্টির কাছে ছেলেটি কৃতজ্ঞ। ছাতার তলে যারা মাথা গুঁজেছে তাদের বিরুদ্ধে এখন তারা দুজনেই। ছাতাধারী অবশ্য কম, অধিকাংশের গায়েই রেনকোট। ছেলেটা কিন্তু কেবল ছাতার কথাই ভাবছিল, কেবল ছাতাই দেখছিল।

জলে ধোয়া চকচকে রাস্তা দিয়ে অনেকক্ষণ হাঁটলে ছেলেটা, একবারও কোনো ফটকে কি কিওস্কের চালের নিচে আশ্রয় নিলে না। তারপর বাড়ি থেকে যত দূরে সম্ভব চলে যাবার জন্যে ট্র্যামে উঠে বসল। সেইখানেই দেখা হল মেয়েটির সঙ্গে।

'ছাতা আমার নেই,' বললে ছেলেটি, 'তাহলে ভাবনা ছিল না। উত্তর গোলার্ধের মানচিত্রের মতো করে তারাগুলো ঠিক মতো ছাতায় বসালেই হয়ে যেত। তারপর ঠিক দিকে ধরলেই বোঝা যাবে কোন তারাটা কোথায়।'

একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল সে। একটু কমে এসেছে অভিমান, আনন্দের তন্ত্রী বাজতে শুরু

করেছে মনের মধ্যে। ছাতা তো কেড়ে নেওয়া যায়, কিন্তু আবিষ্কার তো আর কেড়ে নেবার ব্যাপার নয়।

'কী করে করা যায় তোকে বলি শোন,' বললে ছেলেটা, 'প্রধান কথা ধ্রুব তারাটা কোথায় মনে রাখতে হবে। সেটা সহজ। জানতে হবে উত্তর দিক কোনটা। তারপর...'

'আরে দাঁড়া, দাঁড়া,' বাধা দিলে মেয়েটা, 'আমার ঘটে যে কিছু নেই। তুই প্রথমে এ'কে দেখা, তারপর বুঝিয়ে দিস।'

'এ'কে দেখা মানে?'

'এই ছাতাটায়,' সহজভাবে বললে মেয়েটা, 'এই নে।' এক টুকরো খড়ি বার করে দিলে সে, ফুটপাথে এককা-দোক্কা খেলার ঘর কাটার জন্যে খড়ি থাকে প্রতিটি মেয়ের কাছেই। 'স‍ুঁই ফুটাতে হবেই, এমন কি কথা আছে। খড়ি দিয়েও তারা দেখানো যায়। তাই না? আমার এমন ছাতা খুব কাজে লাগবে!'

সত্যি তো, কথাটা সে ভাবে নি কেন? খড়িতে বরং আরো ভালো। ফুটোগুলো তো রাতে দেখা যাবে না। আর খড়ির ফুটকি সবচেয়ে মিটমিটে ঝলকেও চোখে পড়বে। তার মানে, মেঘলা রাতেও তারাগুলো কে কোথায় আছে সে বুঝতে পারবে।

ছাতাটা খুলল মেয়েটি:

'সত্যিই তোর সব নক্ষত্রমণ্ডলী মনে আছে?'

ছেলেটা একটু গর্বের ভঙ্গিতে চুপ করে রইল।

'নে আঁক,' বলল মেয়েটা।

কিন্তু আঁকা আর হয়ে উঠল না। খড়িটা নেবারও ফুরসুত হল না ছেলেটার। মেয়েটার মা এসে দাঁড়াল তাদের কাছে, লম্বা, নিষ্করুণ, গায়ে বাদামী রঙের রেনকোট, উ'চু টুপি, যেন এক অভিশংসক।

'তাতিয়ানা! ঠিক জানতাম। এক মিনিটও তোকে একা রাখতে নেই। চল, এখানে নামতে হবে। খাবারের দোকানটায় যেতে হবে একবার।'

ছেলেটার দিকে দৃকপাতও করলে না। মেয়েটা কিন্তু চাইলে। আর যাবার সময় ইচ্ছে করেই চে'চিয়ে বললে:

'ফের দেখা হবে।'

'ফের দেখা হবে,' ঝট করে জবাব দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলে ছেলেটা। টের পেলে তার মুখ লাল হয়ে উঠছে। অথচ কী অন্যায়টা সে করেছে? আকাশে যদি না-ও দেখা যায়, তাহলেও কোন নক্ষত্রটা কোথায় আছে সেইটে সে শুধু মেয়েটাকে দেখাতে চাইছিল...

জানলার কাছে ঘেঁসে গেল ছেলেটা। কী একটা যেন খোঁচা লাগল গায়ে। ভুরু কুঁচকে হাত ঢোকাল পকেটে, হাতে ঠেকল এক টুকরো খড়ি।

সার্কাসের কাছে শেষ স্টপটায় নেমে পড়ল ছেলেটা। সার্কাসের মস্ত গম্বুজটা যেন প্রকাণ্ড একটা রুপোলী ছাতা। তার কার্নিসের নিচে কাচের ফিতের মতো ঝকঝক করছে জানলাগুলো। তার ভেতর থেকে কী সব রঙীন ঝলক দেখা যাচ্ছে। ওখানে, রুপোলী ছাতাটার ভেতরে চলেছে রঙচঙা ফুর্তির ফুলঝুরি আর ঘণ্টি। বাজনার হররা ভেসে এল বাইরে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল, যেন ভারি ভারি ফোঁটায় গেঁথে গেল মাটিতে। স্যাঁৎসেঁতে কাঠের ঝাঁঝাল গন্ধ চারিদিকে। ফটকের কাছে খেলোয়াড়নী বুগ্রিমোভার প্লাইউডের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সিংহগুলো লাল লাল মুখ হাঁ করে আছে। স্যাঁৎসেঁতে হয়ে গেছে সিংহগুলো, দেখে মোটেই ভয় লাগে না, রাস্তায় বেড়ালের মতো কেমন যেন মনমরা। ছেলেটার কষ্টই হল ওদের জন্যে।

এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্য লোকের ফুর্তিতে কান পেতে থাকায় আনন্দ নেই। ছেলেটা স্ট্যাণ্ডে এসে একটা ওয়াগনে উঠল। গাড়িটা স্টেশন থেকে যাচ্ছিল লোহা কারখানার দিকে।

কণ্ডাক্টর মেয়েটির বয়স কম, মনটা ভালো। একবার হাই তুললে, কিছুই বললে না। যাচ্ছে যাক। জায়গা অনেক আছে।

ওয়াগনটা প্রায় ফাঁকা। শুধু জানলায় ঠেস দিয়ে চোখের ওপর টুপিটা টেনে নাক ডাকাচ্ছিল একটা লোক। তাছাড়া সামনের বেঞ্চিতে বসে ছিল একজন ক্যাপ্টেন।

চমৎকার ক্যাপটেন। বসেছিল টানটান হয়ে, পায়ের ওপর পা তুলে। ওয়াগনে যখন ঝাঁকুনি দিচ্ছিল, তখন তার হাইবুটের ডগাটা কেঁপে উঠছিল, বাতির ঝলকানি দেখা যাচ্ছিল তাতে। ভারি আশ্চর্য যে এমন আবহাওয়াতেও তার হাইবুট শুকনো, চকচকে। সবকিছুই তার চকচকে: বাদামী বেল্টটা, বোতামগুলো, টুপির ডগা, এমন কি দাড়ি কামানো থুতনিটাও। সবুজ কাঁধপাট্টিতে বসানো তারাগুলোও হলুদ ছটায় জ্বলজ্বল করছিল। একসঙ্গে দেখলে মনে হয় যেন কালপুরুষের মাঝের অংশটা।

ক্যাপ্টেনের হাঁটুর ওপর জলে-কালচে-হয়ে-আসা একটা রেনকোট, তার ওপর ছাতা। মস্ত কালো ছাতা, শাদা বাঁটটা বাঁকানো।

ছাতাটার দিকে চাইছিল ছেলেটা, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা কইবে কিনা ঠিক করতে পারছিল না। আর কী কথা কইবে সেটা ওর জানা আছে। নিজের আশ্চর্য পরিকল্পনাটা সে কেবল নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারছিল না, চাইছিলও না। ব্যাপারটা তো শুধু একলা ওর জন্যে নয়। সমস্ত আবিষ্কার, এমন কি সবচেয়ে ছোটো আবিষ্কারটারও যে উচিত

অন্যকে আনন্দ দেওয়া, এটা ছেলেটা অনুভব করছিল। কিন্তু ভয় হচ্ছিল তার, উচিত মতো হয় তো বলতে পারবে না।

'কমরেড ক্যাপ্টেন,' বললে ছেলেটা, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা কইতে চাই, কমরেড ক্যাপটেন।'

চোখ তুললে ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন যদি একটু অবাক হয়েও থাকে, সেটা ছেলেটার চোখে পড়ল না। মুখের ভাব ক্যাপ্টেনের অবিচলিত। হয়ত তাই হওয়াই উচিত।

'বেশ তো,' অনুমতি দিলে ক্যাপ্টেন, 'বল, কী বলবি।'

'আপনি যদি চান, তাহলে আপনার ছাতায় আমি তারা এ'কে দিতে পারি,' আবেদন জানালে ছেলেটা, মৃদু একটু দীর্ঘশ্বাসও ফেললে।

'কিসের তারা?'

'আকাশে যেমন থাকে,' বললে ছেলেটা, 'তা দেখে বলে দেওয়া যাবে...'

ক্যাপটেনের বাঁ ভুরুটা নড়ে উঠল।

'দাঁড়া, দাঁড়া, ঠিক বুঝছি না। ঠিক করে গুছিয়ে বল। কোন আকাশ, কী উদ্দেশ্য?'

'বেশ,' রাজী হল ছেলেটা, 'বুঝিয়ে বলছি। ব্যাপারটা হল এই, যদি ছাতাটা খুলে তার ভেতর দিকে নক্ষত্রগুলো আঁকা যায়, নক্ষত্র মানচিত্রে যেমন থাকে আর কি, তাহলে একটা ছোট্ট প্ল্যানেটারিয়ম হয়ে যাবে। আমিই এটা ভেবে বার করেছি।' না বলে পারল না ছেলেটা।

'কিন্তু কী জন্যে?'

'তা জানি না... এমনি মাথায় এল।' আনাড়ীর মতো হাসল ছেলেটা, একটু কাঁধ নাড়াল।

'আমি সে কথা বলছি না,' বুঝিয়ে বলল ক্যাপ্টেন। 'তোর প্ল্যানেটারিয়মটার উদ্দেশ্য কী? প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকে।' কথা বলছিল সে জোরে নয়, তার প্রত্যেকটা কথাই যেন চাপা হাই-তোলা। চাঁছা-ছোলা থুতনিটা পর্যন্ত নড়ছিল না।

'মানে... উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য হল এই। দিনের বেলাতেই বলে দেওয়া যাবে কোন তারাটা কোথায়। কিংবা মেঘঢাকা রাতেও। শুধু ছাতাটাকে ঠিকমতো ধরে রাখা চাই... ধ্রুব তারার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে আগে, তারপর...'

'বেশ না হল, কিন্তু কী জন্যে?'

'ধ্রুব তারার দিকে কেন? কারণ এ তারাটা আকাশে বরাবর এক জায়গায় থাকে। ওটা যেন অক্ষ। কারণ পৃথিবী থেকে মনে হয় সব নক্ষত্র ওর চারপাশে ঘুরছে।'

আশ্চর্য, ক্যাপ্টেন কি এসব সত্যিই জানে না?

'ও কথা বলছি না।' একটু যেন ভুরু কোঁচকাল ক্যাপ্টেন, 'কোন তারাটা কোথায় তা জেনে হবে কী? অবস্থিতি নির্ণয়? কিন্তু ছাতায় কি তা হয়? তার নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে। নাকি তোর অন্য উদ্দেশ্য আছে। কী করতে চাস?'

সত্যিই তো, কী উদ্দেশ্যে? কী উপকার হবে সেটা ছেলেটা জানত না। আবিষ্কারেই খুশি হয়ে যায় সে, ভাবে নি তাতে কী উপকার হবে। চেনা তারাগুলোর দিকে একটু বন্ধুর মতো চোখ ঠারা, একে কি উপকার বলবে? নাকি ওটা অমনি।

আর কোন দিকে রয়েছে অভিজিৎ, অগস্ত্য কি শিশুমার তা জানা, আকাশে একটা তারা না দেখা গেলেও তা বলে দেওয়া, এর কি কোনো দরকার আছে?

নাকি তার কোনো দরকার নেই?

'জানি না,' জবাব দিলে ছেলেটা, ক্যাপ্‌টেনের দিকে আর চাইলে না, 'আমি ভেবেছিলাম, জাহাজ যদি যায় চাঁদে কি মঙ্গলগ্রহে, আজ সেটা অমুক নক্ষত্রের কাছে, কাল আরেকটায়, অথচ আকাশ মেঘে ঢাকা, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তখন ছাতা খুললেই দেখা যাবে কোথায় কোন নক্ষত্র, কোনখান দিয়ে উড়ছে রকেট...'

'উড়ে আগে পৌঁছক তো,' বললে ক্যাপ্‌টেন, 'কোনখান দিয়ে উড়ছে, তা বার করবে লোকেটর যন্ত্র।'

জানলার কাছে বসা লোকটা নড়ে চড়ে টুপিটা ঠেলে দিল ওপর দিকে।

'কী বললেন, আবার রকেট কি স্পুৎনিক ছেড়েছে নাকি?'

'উঠে বসুন,' ঘুমন্ত গলায় বললে কন্ডাক্টর মেয়েটি, 'নইলে জায়গামতো নামতে পারবেন না।'

ব্রেক কষল ট্র্যাম, আলগোছে উঠে দাঁড়াল ক্যাপ্‌টেন। লম্বা, খাড়া। সবুজ রেনকোটটা কাঁধে ফেললে।

'ছাতায় আঁকাটাকা ভালো নয়।' বলে পা বাড়াল দরজার দিকে। ছাতাটা লুকিয়ে রাখলে রেনকোটের নিচে। হয়ত ছাতা নিয়ে হাঁটার নিয়ম নেই ক্যাপ্‌টেনদের, হয়ত নিজের জন্যে নয়, অন্য কারো জন্যে ছাতাটা নিয়েছিল সে।

'ভালো নয়,' ঠাট্টাভরে পুনরুক্তি করলে ছেলেটা আপন মনে।

ব্যর্থতায় ভয় নেই তার। আবিষ্কারের আনন্দ চাপা পড়ে ছিল অভিমানের তলে, এখন তা উষ্ণ ঝরণার মতো উচ্ছল হয়ে উঠল। অপেক্ষায় রইল সে: হয়ত হঠাৎ এমন লোকের দেখা পাবে যার কাছে তারাগুলোর প্রয়োজন আছে।

দুজন লোক গাড়িতে উঠে পেছনের চাতালে দাঁড়িয়ে রইল, যদিও সমস্ত বেঞ্চিই ছিল ফাঁকা।

একজন কম বয়েসী, লম্বা, গায়ে খাটো, ফিকে রঙের রেনকোট। মুখ বলতে যেন মোটা মোটা কাচের প্রকান্ড চশমাটা আর ঢিপ কপালটা ছাড়া আর কিছুই নেই। মাথায় এক রাশ কালচে কোঁকড়া চুল; তাতে জলের ছিটে। দ্বিতীয় জনকে মনে হল বয়সে অনেক

বড়ো আর মামুলী: মুখখানা বয়স্ক আর দিনের খাটুনিতে ক্লান্ত লোকের মতো, গায়ে স্যাটিনের কালো ওভারঅল, ধূসর টুপি। তাছাড়া ছাতা, সেটি তার বগলে।

কারো আসল নাম জানা না থাকলে ছেলেটা নিজেই তা ভেবে নিত। ভেবে নিত সঙ্গে সঙ্গেই। আপনিই মাথায় এসে যেত।

'দাবাড়ে' প্রথম লোকটির নাম দিলে সে। আর দ্বিতীয় লোকটির বেলায় তার খুবই মানানসই লাগল 'ওস্তাদ' নামটা।

আলাপ করছিল দু'জনে। আসলে কথা বলছিল কেবল ওস্তাদ, অন্য লোকটি ভদ্রতাভরে শুনছিল, আর মনে হয় বিশেষ আগ্রহ নিয়ে নয়।

'আমি ওকে কাজের লোকের মতো বললাম, 'তুই নিজেকে পেয়েছিস কী, আর্কিমিডিস* হয়ে গেছিস? চোখটা তোর কোথায়? এখানে কতটুকু পর্যন্ত ছাড় চলে? শূন্য শূন্য তিন। আর তোর দাঁড়াচ্ছে শূন্য এক।' আর ও বলে দিলে: 'ইচ্ছে হলে যান গিয়ে কর্তার কাছে নালিশ করুন। খামোকা এরকম মুখঝামটা সইব না বলে দিচ্ছি।''

'বললে খামোকা?' ব্যঙ্গের হাসি হাসলে চশমা-পরা।

'হ্যাঁ, বললে খামোকা... তবে আমিও উকিলী প্যাঁচ ছাড়লাম। বললাম, 'কর্তার কাছে আমি যাচ্ছি নে, তোর কর্তা আমি-ই, আর কাজটা তোকে হাতে কলমে শেখাবার জন্যে এই হোজ পাইপটা নিয়ে ডবল ভাঁজ করে তোর কোমরের নিচে এই সা...''

কুচুটে তার্কিককে সে ঠিক কী ভাবে শিক্ষা দিতে চাইছিল তা দেখাবার জন্যে সে তার ছাতাওয়ালা ডান হাতটা একটু ঘোরাল, কিন্তু দেখাতে পারল না। কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল ছাতাটা আর পেছন থেকে শোনা গেল একটা নিঃশ্বাসের শব্দ, সঠিকভাবে বললে, হঠাৎ একটা যন্ত্রণার সময় দাঁতের ফাঁক দিয়ে টানা বাতাসের আওয়াজ।

'মাপ করবেন!' সঙ্গে সঙ্গেই বলল লোকটা ঘুরে দেখবার আগেই। তারপর ঘুরতেই দেখল ছেলেটাকে।

চোট খাওয়া হাঁটুটা হাত দিয়ে চেপে ধরেছিল ছেলেটা। পুরো এক সেকেন্ড ওস্তাদের মুখখানা হয়ে রইল বিহ্বল আর কোমল। তারপর ভুরু কোঁচকাল লোকটা:

'হল তো... জায়গা তো কম নেই। দূরে দাঁড়ালে ক্ষতি হত কী? চোট লেগেছে? ঈস্ একেবারে ভেজা যে!'

রাগ ফলিয়ে সে হয়ত তার দোষটা চাপা দিতে চাইছিল; হয়ত বা তাড়াতাড়ি 'মাপ করবেন' বলে ফেলার অস্বস্তিটা লুকতে চাইছিল, কেননা ছোটো ছেলেদের কাছে তো কেউ মাপ চায় না।

---

* পুরাকালের বিখ্যাত গ্রীক গণিতজ্ঞ।

'উধোর পিণ্ডি যে বুধোর ঘাড়ে হয়ে গেল, ভিক্তর সেমিওনোভিচ,' একটু বাড়াবাড়ি রকমের হালকা সুরে বললে দাবাড়ে, 'চেয়ে দেখতে হত।'

সিধে হয়ে দাঁড়াল ছেলেটা।

'আমার নিজেরই দোষ... দাঁড়িয়ে ছিলাম...' ওস্তাদের মুখের দিকে চেয়ে বললে ছেলেটা। দৃষ্টিতে তার অনুক্ত একটা অনুরোধ।

'ঠিক আছে... নিজের...'

'সত্যি আমারই দোষ...' প্রায় করুণ সুরে বললে ছেলেটা, 'আনমনা হয়ে ছিলাম।'

'ট্রাম গাড়িতে আনমনা হওয়াটা কাব্যিক স্বভাবের লক্ষণ,' দাবাড়ে এবার কথাটা বললে না হেসে—বলতে কি, বেশি রকম গুরুগম্ভীর সুরে। 'ভাবনা নেই, পাটা ভালো হয়ে যাবে... তাহলে ভিক্তর সেমিওনোভিচ, তারপর কী হল? আপনি হোজ পাইপটা পর্যন্ত বলেছেন...'

'কাকু, একটু শুনুন,' অনুচ্চ স্বরে তাড়াতাড়ি বলে গেল ছেলেটা, 'দিন-না আপনার ছাতাটায় আমি নক্ষত্রমণ্ডলী এঁকে দিই। যেমন প্ল্যানেটারিয়মে হয় আর কি। ছাতাটা খুললেই সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে কোন নক্ষত্র কোথায়। আকাশে মেঘ থাকলেও, এমন কি দিনের বেলাতেও। শুধু ছাতাটার বাঁটটা ধরতে হবে ধ্রুব তারার দিকে। তারপর ঘোরালেই হল...' এবার ও বলে গেল সবটা এক নাগাড়ে, জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না করে, প্রথম কথাতেই সবকিছু খোলসা করে দেবার জন্যে।

লোককে যে সে নক্ষত্রমণ্ডলী উপহার দিচ্ছে!

এবার সে ইচ্ছে করেই 'তারা' বললে না, বললে 'নক্ষত্রমণ্ডলী'। তাতে অতিরিক্ত ব্যাখ্যার দরকার হল না। সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল আকাশের কথা হচ্ছে।

আর হয়ত ওর কথা শেষ পর্যন্ত শুনবে না এই ভয়ে সে কথা কইলে হড়বড় করে, কোনো কোনো শব্দ গলার মধ্যেই ডুবে গেল, আবার পুনরুক্তি করলে সেগুলোর, চেষ্টা করলে যত তাড়াতাড়ি পারে সবকিছু বুঝিয়ে বলতে।

তারপর হঠাৎ থেমে গেল। হঠাৎ সে টের পেলে যা বলবার সব বলা হয়ে গেছে। তাকে ওরা বাধা দেয় নি। চুপ করে গিয়ে সে বিহ্বলের মতো জবাবের প্রতীক্ষায় রইল।

'ব্যাপার বটে-এ,' বললে ওস্তাদ, 'এটা তুই নিজেই ভেবে বার করেছিস নাকি?'

'মানে হ্যাঁ... তাতে কী? খুবই সোজা... কিন্তু তারা দেখা যাবে।' শেষ কথাগুলো বলবার সময় ছেলেটার গলার স্বর ভেঙে এল। তার মনে হল ওস্তাদও হয়ত জিজ্ঞেস করবে: 'কী উদ্দেশ্যে?' চোখ নামিয়ে সে ওস্তাদের কাদা-লাগা বোঁচা হাইবুটটার দিকে চেয়ে রইল।

'মন্দ নয় তো,' বললে দাবাড়ে।

ওস্তাদ কী খানিকটা ভেবে জিজ্ঞেস করলে:

'এটা হাতে কলমে দাঁড়াচ্ছে খানিকটা আকাশের ছকের মতো?'

'মানে হ্যাঁ, মানচিত্রের মতো!' খুশি হয়ে উঠল ছেলেটা, 'তবে তার চেয়ে ভালো। ভ্রাম্যমাণ প্ল্যানেটারিয়মের মতো। জানা যাবে কোথায় কোন নক্ষত্রমণ্ডলী। দেখা যাবে মেঘের মধ্যে দিয়েও...'

'দাঁড়া, দাঁড়া...' ওস্তাদ তার তামাক-খাওয়া হলদে আঙুলে জোরে জোরে থুতনি ঘসলে, 'কয়েকটা জিনিস ঠিক মাথায় ঢুকছে না। এমনিতে অবিশ্যি বোঝা যাচ্ছে, তবে পুরো নয়... যেমন তোর ধ্রুব তারা। এটার মানে কী?'

'ভিক্তর সেমিওনোভিচ, আমি যা বুঝছি—' বাধা দিলে দাবাড়ে, চশমা তার জ্বলজ্বল করে উঠল, 'ভেবে বার করেছে খাসা, যদিও নীতিটা খুবই সরল। আকাশের গোলকটাকে ভাগ করা হল চব্বিশ ভাগে। চব্বিশ ঘণ্টায় তো একদিন...'

'সেটা সবাই জানে,' ঠাট্টা করে হাসল ওস্তাদ।

'তার মানে,' বললে দাবাড়ে, 'এই সময়ের মধ্যে আকাশ আমাদের পুরো এক পাক প্রদক্ষিণ করবে। তাই তো?'

'ঠিক তাই!' সানন্দে বলে উঠল ছেলেটা, 'আমি তো তাই বলতে যাচ্ছিলাম...'

'দাঁড়া, দাঁড়া। তার মানে ছাতাটাকে ঘোরাতে হবে সময় অনুযায়ী। শুধু আগে থেকে হিশেব করে রাখলেই হল...'

'আমি সব হিশেব করে রেখেছি, সত্যি বলছি!' ছেলেটা এবার আশার চোখে চাইলে উৎসাহী দাবাড়ের দিকে, 'আমি মিলিয়ে দেখেছি। মানচিত্রের সঙ্গেও, আকাশের সঙ্গেও। সব ঠিকই হবে। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আর কী ভাবে আগে ধ্রুব তারাকে বার করতে হবে...'

'উঁহুঁ, সত্যিই মন্দ নয় তো,' ফের বললে দাবাড়ে।

'তা বটে, তবে আমার মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না কাণ্ডটা দেখলে কী বলবে, সেটা তোর কাছে মন্দ লাগছে না?'

'কী যে বলেন, ভিক্তর সেমিওনোভিচ! কী আবার উনি বলবেন... তাঁরও ভালো লাগবে।' এক মুহূর্তের জন্যে ভারিক্কি ভাবটা রেখে দাবাড়ে চোখ টিপলে ছেলেটার দিকে।

ওস্তাদ সেটা লক্ষ করে নি। ছাতাটা সে তার সামনে হাতের তালুতে রেখে ঘোরাচ্ছিল, দেখছিল, মন স্থির করতে পারছিল না। ছাতাটা যেন একটা জীবন্ত প্রাণী, যেন ভয় পাচ্ছে ছেলেটা তার অনিষ্ট করবে।

'তা আঁকবি কী দিয়ে?'

'খড়ি দিয়ে। ভয় নেই, আমি খুব সাবধানে আঁকব।'

'তা তোর পরিকল্পনাটা কী?' জিজ্ঞেস করলে ওস্তাদ, 'সবকটা তারাতেই ফুটকি দিবি?'

'কী যে বলেন! সব কি কেউ মনে রাখতে পারে। আমি শুধু আঁকব বড়ো বড়োগুলোকে, নক্ষত্রমণ্ডলীগুলোকে দেখাব।'

'তাহলে তাদের নামও লিখে দিস,' নিঃশ্বাস ফেললে ওস্তাদ, 'নইলে লাভ কী? আমি সপ্তর্ষিমণ্ডল ছাড়া আর কিছুই চিনি না। এমন কি শিশুমারও নয়... লিখে দিবি তো?'

'নিশ্চয় লিখে দেব!' সানন্দে বললে ছেলেটা।

ভেজা পকেটে হাত ঢুকিয়ে খড়ি খুঁজতে লাগল সে।

'ব্যাপার বটে-এ,' টেনে টেনে বললে ওস্তাদ, তারপর হঠাৎ তার বড়ো বড়ো হলদে দাঁত বার করে হাসলে, 'ছাতা মাথায় বাজারে যাবে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না, লুব্ধক না অভিজিৎ কোন একটা তারা দেখবে, তারপর হাতে কলমে একেবারে জমা জলগুলোর মধ্যে! কাণ্ড হবে একখানা! তা যাক গে। আঁক। এখনো অনেকটা পথ যেতে।' এই বলে ছাতা খুলল সে।

ছাতাটা কিন্তু কালো নয়। জলে ভেজায় এবং গুটনো থাকায় বাতির ঝাপসা আলোয় মনে হচ্ছিল যেন কালো। এখন সবাই দেখলে ছাতাটা বাদামী রঙের, সেই সঙ্গে ছেয়ে-ছেয়ে খাঁজ।

আকাশ কখনো কি হয় ছেয়ে-ছেয়ে খাঁজকাটা বাদামী?

নীরবে খড়িটা পকেটে পুরল ছেলেটা।

'ধুরে, ধুর তোকে, নয় একটু খারাপই হবে, কী হয়েছে!' ভেজা জুতোয় মাড়ানো মেজেটায় খোলা ছাতাটা ঠুকল ওস্তাদ, 'মানে কী জানিস, বাঁটদুটো একই রকম।' দাবাড়েকে সে ব্যাখ্যা করল, 'প্রায়ই গোলমাল হয়ে যায়। এ ছাতাটা ক্লাভদিয়ার, ওই যে আমাদের রেট ঠিক করে যে।'

'কী আফশোস!' বললে দাবাড়ে।

ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলেছে ট্র্যামটা। চাতালের ওপর মিটমিট করছে বাতির ঘুমন্ত আলো। ঝিমুচ্ছে বিরল দু'চার জন যাত্রী। শুধু জানলার বাইরে অশ্রান্ত ঝরে যাচ্ছে বৃষ্টি।

সাত নম্বর ট্র্যামটা ছাড়ল লোহা কারখানা থেকে শহর কেন্দ্রের দিকে। অনেকক্ষণ ট্র্যামে কেউ উঠল না, প্রথম স্টপে যারা উঠেছিল, তারাই চলেছে।

তারপর উঠল একটা খোকা। গায়ে খাটো রেনকোট, পায়ে রবারের হাইবুট। হাইবুটটা খুবই ঢিলা, পায়ে লটপট করছিল। 'মায়ের জুতো' ভাবলে ছেলেটা।

সামনের চাতালে গিয়ে দাঁড়াল খোকা। একটা হাতে তার দুধের ক্যান, অন্য হাতে খোলা ছাতা।

ছোট্ট সবুজ ক্যানটা নিশ্চিন্তেই ছিল, শুধু একবার সিঁড়িতে তার তলাটা ঠোকর খায় আর সরোষে ভেঙচি কাটে ঢাকনিটা। তবে সেটা তেমন ভয়ঙ্কর নয়, ফিতে দিয়ে কবজার সঙ্গে আটকা ছিল ঢাকনিটা, কখনো কোথায় হারিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু বাগ মানছিল না ভারি ছাতাটা। টান টান কালো কাপড়ে হাট করে খোলা ছাতাটা কিছুতেই দরজা দিয়ে ঢুকতে চাইছিল না। তাছাড়া অত বড়ো আর বেয়াড়া ছাতাটাকে এক হাতে কি সামলাতে পারে ওইটুকুন একটা খোকা?

ট্র্যাম ছাড়ল। ঝাঁকুনিতে কেঁপে উঠল খোকা। তারপর রেগে গায়ের সবখানি জোর দিয়ে টানতে লাগল ছাতাটাকে।

'ভেঙে ফেলবি যে,' ছেলেটি বললে, 'সত্যি কী শুরু করেছিস তুই?'

এগিয়ে গিয়ে সে ছাতাটার বাঁট ধরল।

'বন্ধ করতে হয় আগে।' বলে বন্ধ করলে। ছাতাটা মুড়ে গিয়ে বাধ্য হয়ে উঠল।

পুরনো স্কুল ইউনিফর্মের ভাঙা টুপির তল থেকে চাইল খোকাটা, দোষীর মতো চোখ মিটমিট করে বললে:

'খুব কড়া, বন্ধ হতে চায় না।'

'কড়া!.. এমন রাতে এইটুকুন একটা খোকাকে পাঠানো! যাচ্ছিস কোথায়?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলে ছেলেটা। এই প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, হয়ত বা এখনো স্কুলেই ভর্তি হয় নি, এর কাছে সে এখন বয়স্ক, শক্তিশালী।

'ক্রীম কিনতে যাচ্ছি,' ভীরুর মতো বললে খোকা, ফের চোখ তুললে। তার হাট করে মেলা ভয় পাওয়া চোখদুটো টুপির ছায়ায় মনে হচ্ছিল ভারি কালো আর বড়ো বড়ো। খোকা বুঝে উঠতে পারছিল না: কে জানে হয়ত রাত্রে, তাতে আবার বৃষ্টিতে দোকানে যাওয়া তার বারণ; হয়ত তাকে জেরা করার পুরো অধিকার আছে এই ভুরু কোঁচকানো ছেলেটার। এক্ষুণি হয়ত বলে উঠবে, 'চল থানায়।' হয়ত আরো ভয়ঙ্কর কিছু একটাও বলতে পারে...

'দেখবি, তোর ছাতায় আমি রাতের তারা এঁকে দেব?' বললে ছেলেটা।

নিজেই সে জানত না কী তাতে লাভ। খোকা তো জানেও না নক্ষত্ররা কীভাবে ঘোরে। কিন্তু কথাটা কেমন যেন বেরিয়ে এল আচমকা, মুখ ফসকে। যেন জিভের ডগায় আটকে ছিল, ছাতা দেখা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে।

খোকার চোখ আরো কালো আর বড়ো হয়ে উঠল।

'রাতের তারা?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলে খোকা। ছোট্ট ভুরুটা কপালে তুলল।

'হ্যাঁ, তারা,' জবাব দিলে ছেলেটা। ভাবছিল এক্ষুণি ছেলেটাকে নক্ষত্রমন্ডলী এ'কে দেবে। অন্তত এবার তার কপাল ভালো।

'ছাতাটা হবে ঠিক একটা ছোট্ট আকাশের মতো, বুঝলি তো?' বোঝাল সে, 'চারিদিকে মেঘ বৃষ্টি, কিন্তু তোর মাথার ওপর তারা। ঠিক যেন আসল আকাশ। দেখবি?'

'ছোট্ট আকাশ?' প্রায় যেন গান গেয়ে উঠল খোকা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! আয় দে...'

হয়ত অত তাড়াহুড়া না করলে ভালো হত। তাড়াহুড়োয় ভয় পেয়ে গেল খোকা।

'না, না!' চিৎকার করে আপত্তি জানিয়ে সে ছাতাটা আঁকড়ে ধরল, 'না, না, হাত দিও না!'

কিছু দূরে বসে ছিলেন দুজন মহিলা। নিশ্চয় ছেলেটার ভয় পাওয়া চিৎকার শুনে এক ঝটকায় মুখ ফেরালেন। কে পেছনে লেগেছে খোকাটার?

'একেবারে বোকা তুই,' ক্লান্ত গলায় বললে ছেলেটা, 'আমি তোর ছাতাটা কেড়ে নিতে যাচ্ছিলাম না... ভেবেছিলাম এ'কে দেব, এমন তোর ছাতা হবে যা আর কারো নেই। ভারি ইয়ে তুই...'

ওখান থেকে সরে গিয়ে একটা ফাঁকা বেঞ্চিতে বসল সে।

ট্রাম ছুটছে অন্ধকার পার্ক বরাবর। জানলার ওপাশে আলো দেখা যাচ্ছে না। যেন তা স্বচ্ছ নয়। শার্শিটা একটা কালো আয়নার মতো, তাতে নিজের ছবিই চোখে পড়ছিল তার।

আর নিজের পেছনে ও দেখল খোকাকে।

অলক্ষে কাছিয়ে এল খোকা। লোহার চাকার ঝকঝকানিতে তার রবারের হাইবুটের শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। কাছিয়ে এসে সে দাঁড়িয়ে রইল বেঞ্চির কাছে, ভারি ছোট্ট, কেমন যেন দোষী-দোষী।

'অনেক তারা আঁকবে তুমি?'

'অনেক,' খুশি হয়ে বললে ছেলেটা, ঘুরে বসল। 'বস, আমি তোকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

পাশেই বসল খোকা।

ছাতাটা খুলল ছেলেটা। ডগাটা গুঁজল সামনের সীটের পিঠে, আর বাঁটটা রাখল নিজের কাঁধে। এবার সামনে তার ছোট্ট একটা কালো গম্বুজ।

'এই দ্যাখ!' টানটান কাপড়টায় খড়ি ঘসল সে, 'এইখানে, একেবারে মাঝখানটায়, চিরকাল এইখানে থাকবে ধ্রুব তারা।'

'চিরকাল?' জিজ্ঞেস করলে খোকা, ফের তার ছোট্ট ছোট্ট ভুরু কুঁচকে।

'বরাবর।'

'আর দিনের বেলায়?' সেয়ানার মতো খোকা হাসল।

'দিনের বেলাতেও। শুধু সূর্যের আলোয় তারা দেখা যায় না।'

চোখ মিটমিট করলে খোকা।

'এই দ্যাখ,' বলে চলল ছেলেটা, 'এইখানে সাতটা তারা, সাত মুনির মতো দেখতে। এই হল সপ্তর্ষিমণ্ডল...'

'সপ্তর্ষি?'

'হ্যাঁ।' অধীর হয়ে চোখ কুঁচকাল ছেলেটা, 'কেন, কখনো শুনিস নি?'

খোকা মাথা নাড়ল।

'এইগুলো বুঝি তারা?' খড়ির বিন্দুগুলোর দিকে সে আঙুল দেখাল।

'মানে... হ্যাঁ,' সাবধানে বললে ছেলেটা।

'উ'হু।' সজোরে মাথা নাড়লে খোকা, 'ও রকম না। ছটা বেরুচ্ছে এমন তারা আঁকো।'

'কেমন ছটা?'

'এই রকম!' বলে খোকা শূন্যে পঞ্চমুখী একটা তারা এ'কে দেখাল, 'বড়ো বড়ো করে।'

ছেলেটা হতাশে তার হাত নামিয়ে নিয়ে জানলার দিকে ফিরল।

'তারা ওরকম হয় না।'

'আঁকো-না!' আস্তে মিনতি করলে খোকা।

'ও রকম বড়ো বড়ো তারা সব আঁটবে না।' মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিলে সে।

'তা হোক, কিছু তো আঁটবে...'

'সত্যিকারের তারা হবে না ওগুলো।'

'নিজেই বললে আঁকবে, আর...' কষ্টে কথাগুলো বলতে পারল খোকা।

শেষ পর্যন্ত ওর দিকে ফিরে তাকাল ছেলেটা। টুপির ছায়াটা এখন আর ওর মুখে পড়ে নি, ভেজা ভেজা কালচে চোখের ওপর ট্রামের বাতির ছটা।

ঠিক যেন অভিমানের ঝিলিক।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে ছেলেটা। অভিমান কী তা সে জানে।

'বেশ আঁকছি,' বললে সে।

ঝনঝন, ঝকঝক, ঢংঢং করে চলেছে আধশূন্যি রাতের ট্রামগাড়ি। এক এক বার থামছে আবার ছুটছে। উঠছে নামছে যাত্রীরা। আর যে বেঞ্চিটায় বসে আছে দুটি ছেলে, একজন ছোট, আরেক জন কিছু বড়ো, সন্তর্পণে যাদু ঘনিয়ে উঠছে সেখানে: কালো ছাতাটা বদলে যাচ্ছে রূপকথার আকাশে।

বড়ো বড়ো, শাদা শাদা তারা আঁকলে ছেলেটা: পঞ্চমুখী, অষ্টমুখী, দশমুখী। এমন সব নক্ষত্রমণ্ডলী গড়ে তুলল ওরা, যা কোনো জ্যোতিষী কখনো দেখে নি। ছেলেটার

কাঁধ ঘেঁসে বসে ছিল খোকা, নড়ছিল না। মুখ তার একটু হাঁ হয়ে আছে, নিচের ঠোঁটটা ঝুলে আছে একটা গোলাপী অর্ধচন্দ্রের মতো। তারাগুলো থেকে চোখ না সরিয়েই খোকা হাইবুট থেকে বাদামী রঙের মোজা পরা পা-দুখানা বার করে নিলে, বেঞ্চির ওপর গোড়ালি রেখে হাঁটুদুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। এ ভাবে বসায় আরাম বেশি। পরিত্যক্ত হাইবুট জোড়া দুলতে থাকল, ঠেলাঠেলি করল পরস্পরের সঙ্গে, ভেতরে তাদের লাল আস্তর দেওয়া, মনে হচ্ছিল যেন অবাক হয়ে হাঁ করে আছে। বুঝতে পারছে না কী ঘটছে ওখানে।

আর সীটের একেবারে প্রান্তে অধীর হয়ে ঠুনঠুন করতে লাগল ভুলে যাওয়া ক্যানটা। কাঁপছিল গাড়িটা, আর মনে হচ্ছিল যেন খুব ছোট্ট, কৌতূহলী কেউ ক্যানটার ভেতরে লাফালাফি করছে, মাথা দিয়ে ঢাকনিটা তুলে দেখতে চাইছে কী হচ্ছে বাইরে।

চটপট নিপুণভাবে এঁকে গেল ছেলেটা। প্রথমটা অসুবিধা হচ্ছিল : ভেজা কাপড়ে খড়ির দাগ ধরছিল না। কিন্তু ছেলেটা উপায় বার করলে। প্রথমে ধারটা এঁকে হালকা আঁচড়ে তারাগুলো ভরে তুলতে লাগল।

'আচ্ছা,' হঠাৎ খেয়াল হল তার। কেবল এখনই খেয়াল হল, 'বাড়িতে তোকে বকবে না তো?'

'না, বকবে না।'

জ্বলজ্বল করছে খোকার চোখ। এমন সুন্দর জিনিসের জন্যে কেউ কখনো বকতে পারে!

'একটা চাঁদ আঁকো না?' আনন্দ ফিসফিক করে মিনতি করলে খোকা, 'এই জায়গাটায়...'

'গোল চাঁদ, নাকি চন্দ্রকলা।'

'গোল... চন্দ্রকলা দুই-ই।'

'আরে না,' থামিয়ে দিলে ছেলেটা, 'এ তো যে হয় না।'

'তাহলে গোল চাঁদ।'

একটা বড়ো পূর্ণিমার চাঁদ আঁকলে ছেলেটা, কাপড়ের আকাশ হয়ে উঠল আরও আশ্চর্য।

'আর একটা স্পুৎনিক,' অনুরোধ করলে খোকা।

স্পুৎনিকটার চেহারা দাঁড়াল একটা গাজরের মতো, মাথায় তার ঝুঁটি। খোকা কিন্তু খুশি হল। মাথার ওপর ছাতাটা তুলে বাঁট ধরে ঘুরতে লাগল সে। ছোট্ট আকাশের ধার ঘেঁসে ছুটতে লাগল স্পুৎনিক, সেই সঙ্গে চাঁদ আর তারারাও ঘুরতে লাগল এক রূপকথার চড়ক দোলায়...

‘ওই যা,’ বলে উঠল ছেলেটা, ‘আর থাম!’ খোকার হাত চেপে ধরলে সে। থেমে গেল আকাশ। ‘কোথায় যাচ্ছি জানিস? কোথায় তোর দোকান?’

দুলে উঠল আকাশ। ঝট করে হাইবুটে পা ঢোকালে খোকা। চোখ তার এখন একেবারে গোল, মুখখানা একেবারে হাঁ।

‘কাঁদবি না বলে দিচ্ছি,’ বললে ছেলেটা।

কিন্তু কী করবে সে এই খোকাটাকে নিয়ে? নক্ষত্র উপহার দিয়ে তারপর অমনভাবে ফেলে আসা যে চলে না।

‘ঠিক আছে, ক্রীম তোর পালাবে না।’

নেমে অন্য গাড়ি ধরে ফিরে গেল তারা। দোকানটা খুঁজে বার করে ক্রীম কিনলে, তারপর স্টপে এসে দাঁড়াল ট্র্যামের জন্যে। দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ, একই ছাতাটার নিচে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো এখন হয়ে উঠেছে বিরল আর বড়ো বড়ো। চড়বড় করে তা পড়ছে ছাতার ওপর। ভেজা পিচঢালা রাস্তাটা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে ল্যাম্প-পোস্টের বাতি, তাতে আলো হয়ে উঠছে ছাতার নিচের শাদা শাদা তারা আর চাঁদ।

ছেলেটা ফুটপাথ থেকে নেমে গেল দেখতে গাছগুলোর ওপাশে ট্র্যামগাড়ির আলো চোখে পড়ছে কি না।

‘যাচ্ছ কোথায়? আমাদের আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকো,’ উদ্বিগ্ন হয়ে বললে খোকা।

ট্র্যাম যখন এসে পড়েছে, তখন ওর খেয়াল হল:

‘যাঃ, কোপেক তিনটি তো ফেলা হয় নি!’

ওই ট্র্যামে কণ্ডাক্টর ছিল না। ছিল শুধু একটা ক্যাস বাক্স, যাত্রীরা নিজেরাই সেখানে তিন কোপেক ফেলে দিয়ে একটা করে টিকিট ছিঁড়ে নেয়।

‘তাতে কী হয়েছে,’ সান্ত্বনা দিলে ছেলেটা, ‘এবার গিয়ে ছ’কোপেক ফেলবি। একই তো কথা।’

‘হ্যাঁ, একই কথা,’ সায় দিলে খোকা।

গাড়িতে উঠতে তাকে সাহায্য করল ছেলেটা। সাহায্য করেই চলে গেল।

খোকা ভেবেছিল হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাবে। কিন্তু কী করে? এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে ক্রীমের ক্যান। তাই শুধু চেয়ে রইল ওই বড়োসড়ো দিলদরিয়া ছেলেটার দিকে, যে তাকে এক আশ্চর্য আকাশ দিয়েছে।

খোকাকে বিদায় দিয়ে ছেলেটা ফিরল দোকানটায়। আগের বার এখান থেকে বেরবার সময় তার মনে হয়েছিল দরজার কাছে যেন একটা তিন-কোপেকী মুদ্রা পড়ে আছে।

খোকার সামনে তখন সেটা তুলতে তার কেন জানি লজ্জা হয়েছিল। অথচ কোপেক তিনটে তার দরকার। বিনা ভাড়ায় যেতে তার ইচ্ছে করছিল না। বিছছিরি লাগে। তাই ফিরল ছেলেটা।

দরজার কাছে তিন কোপেকটা নেই। ভেবেছিল রাস্তায় বেরবে, কিন্তু এখন সেখানে হাওয়া দিচ্ছে আর এমন জোর বৃষ্টি নেমেছে যে মনে হয় রাস্তাটা ফুটছে।

আগেই ভিজে যাওয়া ছেলেটার পক্ষে এ বৃষ্টিটা সইবার মতো মনে হল না। সঙ্কীর্ণ লবিটায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে, ঠিক করল বৃষ্টি ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ছুটে ঢোকা লোকজনদের যাতে ব্যাঘাত না হয় তার জন্যে সে দাঁড়িয়ে রইল দেয়াল ঘেঁসে। বৃষ্টির তোড় থেকে বাঁচার জন্যে তারা তাড়াতাড়ি ছুটে আসছিল দোকানটায়।

তাড়া দেখা গেল না কেবল একজনের। ইনি হলেন বেশ মোটা মতো এক গিন্নি, গায়ে হুড দেওয়া স্বচ্ছ রেনকোট। ঢুকতেই গোটা লবিটা ভরে গেল তার দেহে। সশব্দে নিঃশ্বাস নিতে নিতে সেখানেই থেমে গেল। হাতে তার প্ল্যাস্টিকের রঙীন ফিতে দিয়ে বোনা একটা ব্যাগ। লবির আলোয় তা ঝকমক করছিল। ব্যাগের ভেতর থেকে ময়ূরের সবুজ লেজের মতো বেরিয়ে আছে এক গোছা পেঁয়াজ কলি। তাড়াহুড়ো করে আসা যাওয়া করছিল লোকে, দেবে যাচ্ছিল সবুজ লেজটা, কেঁপে উঠছিল ব্যাগটা আর ছেলেটার প্যাণ্টে এসে লাগছিল ভেজা পেঁয়াজ কলির ছোঁয়া।

ব্যাগের মালিক তার প্রকাণ্ড মুখখানা ফেরালে ছেলেটার দিকে। চোখদুটো তার কেমন যেন লালচে।

'এটা আবার এখানে কেন?' কথাটা সে বললে এতই হড়বড় করে যে দাঁড়াল 'এটাবার খানেকেন?' 'এটাবার খানেকেন?' ফের কথাটার পুনরুক্তি করে সে যন্ত্রের মতো তার গোল মুঠোয় ব্যাগের হাতলটা আরো জোরে চেপে ধরল, 'কী চাই ছোঁড়ার? দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

'তাতে আপনার কী?' বললে ছেলেটা।

'তোদের আমরা ভালোই চিনি!' হাঁসফাঁস করে উঠল রঙীন ব্যাগের মালিক, 'পরের পকেটে নজর।'

রাগ ফুঁসে উঠল ছেলেটার মনে, কিন্তু সে রাগ বরফ জলের মতো ঠাণ্ডা ও স্বচ্ছ। চেঁচামেচি করলে না সে, চোখও নড়াল না।

এক মুহূর্ত চুপ করে দেখে লালচে চোখদুটোর দিকে সরাসরি তাকিয়ে স্পষ্ট করে বললে:

'ধুমসো হাতি। ময়দার বস্তা।'

তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে। পেছনে শোনা গেল দম আটকানো চিৎকার।

ছেলেটা কিন্তু পেছনে না তাকিয়ে মরিয়ার মতো হাত দুলিয়ে ছুটতে লাগল। ছুটছিল ভয় পেয়ে নয়, গলায় কান্না ঠেলে আসছিল বলে।

তবে এবারও ছেলেটাকে শান্ত করে তুলল বৃষ্টি। তারপর বৃষ্টি নিজেও শান্ত হয়ে এল, সমতাল আর মৃদু।

ছেলেটা তখনো ছুটছিল, তবে জোরে নয়, শেষ পর্যন্ত থামল চেখভ আর পাভলিক মরোজভ রাস্তার মোড়ে। এখানে ট্রাম থামে। ছেলেটা ঠিক করলে ট্রামে চেপে বাড়ি ফিরবে। টিকিটের পয়সা নেই যখন, বিনা টিকিটেই, জানত বাড়িতে দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে, খোঁজাখুঁজি করছে, আরো অনেক ভোগান্তি আছে আজ তার কপালে, কিন্তু সে কথা সে ভাবলে কেমন ক্লান্তভাবে, উদাস মনে।

দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

ট্রাম যাচ্ছিল নানা ধরনের: পুরনো, লজ্‌ঝড়ে, আবার নতুন ট্রামও আছে, তাদের অটোমেটিক দুয়োর, রুপোলী ঘণ্টি। কিন্তু যে নম্বরের ট্রামটা তার দরকার, তার দেখা নেই।

বড়ো বড়ো গোল গোল ফোঁটায় বৃষ্টি হয়েই চলেছে...

হঠাৎ ওর মাথায় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। ফোঁটাগুলো তখন আছড়ে পড়ছিল রাস্তার অ্যাস্‌ফল্টে আর গাছের পাতায় পাতায়।

মাথা তুলল সে, দুটো কালো কালো খাঁজকাটা গম্বুজ তার মাথার ওপর এসে মিলেছে, বৃষ্টি থেকে বাঁচাচ্ছে তাকে।

নাও, আবার এক ঝামেলা! ঠিক করলে ছাতার তল থেকে সরে যাবে, রেগে পা বাড়ালে সে। কিন্তু কে একজন তাকে থামালে:

'তুই যে একেবারে হাড় পর্যন্ত ভিজে গেছিস।'

কথাটা বললে একটা মেয়ে। ছেলেটার মনে হল যেন ওটা উপহাস। ভেজা পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল।

পেছনে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন। ওরাই তার মাথায় ছাতা ধরে ছিল। একজন পুরুষ আর মেয়েটি। মুখ প্রায় ধরা যায় না। রাস্তার আলো কেবল বেণী থেকে খসা একটুখানি চুল ছুঁয়ে গেছে মেয়েটার। পুরুষ মানুষটা পুরোপুরি ছায়া-ঢাকা। লম্বা, কালো স্যুট, স্বল্পভাষী।

'তুই যে ভিজে জবজবে হয়ে গেছিস,' পুনরুক্তি করলে মেয়েটা।

'সত্যি?' ব্যঙ্গ করে বললে ছেলেটা, 'আর আমি ভাবছিলাম আমি একেবারে শুকনো।'

খুক করে হেসে উঠল মেয়েটা:

'ওটা তোর ভুল। আসলে তুই ভিজে জবজবে। জলে পড়া মুরগীর বাচ্চার মতো।'

জবাবে সঙ্গে সঙ্গেই পিত্তি জ্বালানো কিছু একটা বলা দরকার ছিল, পুরুষ মানুষটা সেটা হতে দিল না।

'লেনোচকা, চুপ করে থাক,' নিচু ঘড়ঘড়ে গলায় বললে সে।

ছেলেটার মনে হল নিশ্চয় লোকটার মুখখানা হবে শক্ত গোছের, কিন্তু ক্লান্ত, তাতে টানটান চড়া বলিরেখা আছে।

'থাম বাপু,' বললে লোকটা, 'তুই যদি তোর সখাদের সঙ্গে অমনভাবে কথা বলিস, তাহলে সত্যি বলছি, আমি কিন্তু ওদের পক্ষ নেব।'

'সখা!' খিলখিলিয়ে হেসে উঠল মেয়েটা।

ছেলেটা ধীরে ধীরে, কিন্তু দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে গেল ছাতার তল থেকে।

'মিছেমিছি জলে ভিজছিস,' অপরিচিত লোকটা বললে পেছন থেকে।

'বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে আমার কী দোষ?' জবাব দিলে ছেলেটা।

'সেটা ঠিক... তবে এখন তুই মিছেমিছি ভিজছিস। কারো ওপর রাগ ফলাচ্ছিস নাকি?'

'ফলালেই বা!' বললে ছেলেটা।

'তা তোর যা ইচ্ছে,' নিঃশ্বাস ফেললে লোকটা।

'নিশ্চয়,' জবাব দিলে ছেলেটা।

'বাবা, ওকে ঘাঁটিও না,' বাধা দিলে মেয়েটা। 'হুল ফুটাবে।'

বোঝাই যায় মেয়েটার ধৈর্যগুণ নেই।

এদিকে ট্র্যামের এখনো দেখা নেই...

ছেলেটার ভেজা কুর্তাটা হয়ে উঠল নিরেট আর অয়েলক্লথের মতো চকচকে। ঝাঁক ঝাঁক জলের গুলির মতো তার ওপর বৃষ্টি পড়ছিল সশব্দে।

'অনেক দিন আমি দেশে ছিলাম না, বৃষ্টিতে ভেজার অভ্যেস চলে গেছে,' বললে মেয়েটার বাবা। 'তাই আমার ভুলও হতে পারে, তাহলেও আমার মনে হয় ওই ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজাটা তেমন মজাদার নয়।'

'অনেকক্ষণ ট্র্যামের দেখা নেই,' ভাবলে ছেলেটা, 'পায়ে হেঁটেই বাড়ি যেতে হয়।' এবং পায়ে হেঁটেই এগুল সে।

'দাঁড়া, দাঁড়া,' পেছন থেকে সেই প্রশান্ত কণ্ঠস্বরটা ভেসে এল। 'ছাতাটা নে। সত্যি বলছি। আমাদের একটাতেই হয়ে যাবে। ফেরত না দিলেও চলবে।'

'দেখাতে চাইছেন উনি কেমন দয়ালু,' ভাবলে ছেলেটা, এবং বললে:

'ছাতায় আমার দরকার নেই। অন্তত বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে ছাতা আমার লাগবে না।'

শেষ কথাটা কেমন জানি আপনা থেকেই জিভ থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু তার জন্যে

আফশোস করবে না ছেলেটা। কথাটা বলার পর সে ভাবছিল একটা জবাব আসবে। কিন্তু লোকটা আর মেয়েটা চুপ করেই রইল। হয়ত অবাক হয়ে গেছে?

তখন সে সরাসরিই জিজ্ঞেস করলে:

'ভাবছেন ছাতা দরকার কেবল বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যে?'

'উঁহুঁ, কে বললে?' বেশ গম্ভীরভাবেই বললে লোকটা, 'আমরা তা ভাবি না। যেমন, ছাতা নিয়ে ছাদ থেকে লাফানো খুবই আনন্দের কাজ... কিংবা তার শিকগুলো খসানো...'

'আর বাঁট-টা যদি বাঁকানো হয়, তাহলে কারো পায়ে লাগিয়ে ল্যাং মারা যায়,' সমান গম্ভীরভাবেই যোগ দিলে মেয়েটা, 'খুব সুবিধে তাতে।'

তারপর দুজনেই অনুচ্চে হেসে উঠল, আর তাতে যেন অপমান করার কোনো ভাব ছিল না। ছেলেটার মনে হল, একেবারেই কোনো অপমান নেই তাতে। তবে পুরনো ক্ষোভ আর ব্যর্থতা কি তার কম!

'হাসছেন!' বলল সে, 'ছাতাটা দিয়ে দিতেও আপনাদের কষ্ট হচ্ছে না। আমি যাতে বৃষ্টিতে না ভিজি, তার জন্যে ছাতাটা দিয়ে দিতেও...'

'এই এতটুকুনও কষ্ট হচ্ছে না,' সায় দিলে লেনা।

'কিন্তু অন্য কাজে দিতে হলে নিশ্চয় কষ্ট হত...'

'অন্য লোকের চেয়ে তুই ভালো-টা কীসে...' অবাক হল বাপ।

'আমি সে কথা বলছি না,' গোমড়া মুখে বলল ছেলেটা, 'আমি বলছিলাম অন্য কথা, লোকের কথা নয়... বেশ, দিন, আমি আপনাদের নক্ষত্র এঁকে দিচ্ছি। আঁকব?'

ও একেবারেই ভাবে নি যে ওরা রাজী হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গেই ওরা বুঝল ব্যাপারটা কী।

প্রথমটা ছেলেটা ভেবেছিল ওরা নিতান্ত করুণা করছে তাকে।

'ওই যে আপনাদের ট্র্যাম আসছে,' বলল ছেলেটা। এবার তার ভাগ্য পরীক্ষা হবে। তার দৃঢ় ধারণা ছিল, ট্র্যাম আসতেই বাপে-মেয়েতে চটপট উঠে পড়বে, সেখানে যে শুকনো, সেখানে যে জ্বলজ্বলে আলো।

'আসুক, এই তো আর শেষ ট্র্যাম নয়, আরো আসবে...' জবাব দিল লোকটা।

'ওই কিওস্কটার ওখানে যাওয়া যাক,' প্রস্তাব দিল মেয়েটা। 'আলো আছে ওখানে... আর সত্যিই তুই সব নক্ষত্রমণ্ডলী জানিস?'

'একেবারে খুকি!' মনে মনে ভাবল ছেলেটা। নাকি মনে মনে নয়, ফিসফিস করে হয়ত বলেই ফেলেছিল, কেননা বাপ আপত্তি করলে:

'কী যে বলিস, প্রায় বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে।'

'বাবা! কী বলছ!'

'চটছিস কেন! আমি যে বললাম 'প্রায়'।'

বন্ধ ফাঁকা কিওস্কটায় জ্বলজ্বল করছিল একটা বাতি আর কাচের কেসের ওপাশ থেকে পথচারীদের দিকে বোকার মতো চেয়ে দেখছিল প্ল্যাস্টিকের সব পুতুল।

এইখানে ছেলেটা তার নবপরিচিতদের দিকে চেয়ে দেখলে। লোকটার সত্যিই শক্তপানা মুখ, তাতে চড়া চড়া বলিরেখা, মুখের দুপাশে শক্ত ভাঁজ। একটু যেন চেনা মুখ। আর মেয়েটা তাদের পাইওনিয়র নেতা লুদ্যুসার মতো, যে চলে গেছে ভ্লাদিভস্তকে।

ছাতাটাকে ছেলেটা দেয়ালে ঠেসে ধরল, আর পেছন থেকে লোকটা আর তার মেয়ে অন্য ছাতাটা মেলে ধরল, যাতে ছেলেটা না ভেজে।

খড়ি বার করলে ছেলেটা।

'না, না, খড়ি দিয়ে নয়।' ওকে থামাল লোকটা, তারপর নানাখাপী একটা ছুরি এগিয়ে দিল তার দিকে, 'খড়ি তো মুছে যাবে, আলোতে দেখাও যাবে না। ফুটো করার একটা শূলে আছে ওতে। নে, ফুটো কর...'

লোহার ঝন্‌ঝন্‌ তুলে ছুটে জ্বলজ্বলে ট্রামগুলো আসছে, যাচ্ছে, নীরব হয়ে যাচ্ছে রাস্তার অন্ধকারে। ঝরঝর করছে বৃষ্টি, ঝমঝম করছে, ছাট দিচ্ছে। এই সব শব্দ যেন এক আনাড়ী তবু ভারি ফুর্তির কোনো গানের মতো।

সূক্ষ্ম একটা কিরণের মতো উজ্জ্বল ছুঁচলো শূলটা দিয়ে ছেলেটা কালো আকাশে তারা ফুটিয়ে চলল।

মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিল পথচারীরা, অবাক হচ্ছিল এই দেখে যে প্রায় নতুন একটা ছাতা ফুটো করে চলেছে তিনটে উন্মাদ।

মাঝে মাঝে পেছন থেকে মেয়েটার বাবা ফিসফিস করে নক্ষত্রমণ্ডলীর নাম বলছিল:

'কালপুরুষ... আচ্ছা... এটা হল লঘু...'

'এবার ছাতাটা তুমি সঙ্গে নেবে?' মেয়েটিও জিজ্ঞেস করলে ফিসফিস করে।

'হ্যাঁ,' বলল লোকটা।

ওদের কথাটা ঠিক বুঝল না ছেলেটা, তাহলেও কিছু জিজ্ঞাসা করল না। ফুটো করার কাজ চালাতে চালাতে শুধু বললে:

'যাই বলুন, খড়িই ভালো। দেখুন না ছাতাটা ফুটোয় ভরে গেল।'

'তাতে এসে যাবে না,' বললে লোকটা, 'আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে বৃষ্টি হয় না।'

'নিশ্চয় মরুভূমিতে,' সিদ্ধান্ত করলে ছেলেটা। তাহলেও অনুমানটা যাচাই করার জন্যে জিজ্ঞাসা করলে:

'দক্ষিণে?'

'যা সত্যি তা সত্যি। একেবারে দক্ষিণে।'

'সেখানে বৃষ্টি হয় না,' সানন্দে ভাবল ছেলেটা, 'তার মানে ছাতাটা উনি নিয়ে যাবেন কেবল আমার নক্ষত্রগুলোর জন্যে।' এই ভেবে ভারি ভালো লাগল তার। এ সন্ধ্যার সবচেয়ে ভালো ভালো ঘটনাগুলোই কেবল মনে পড়তে লাগল তার। দেখা গেল ভালো ঘটনা কম নয়: অল্প পরিচিত সেই মেয়েটি, হাইবুট পরা মজার খোকাটা... এরা দুজন...

হঠাৎ আবার একটা দুশ্চিন্তা শুরু হল তার।

'কিন্তু দক্ষিণে যে ভারি অন্ধকার রাত। ফুটো দিয়ে যে কিছু দেখতে পাবেন না!'

'দেখা যাবে,' বললে লোকটা, 'আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে রাত খুব ফরসা।'

'তাজ্জব,' ভাবলে ছেলেটা, কিন্তু আর বেশি জিজ্ঞেস করলে না, সংকোচ হল। তাছাড়া পরিহাসপ্রিয় লেনা তাকে কৌতূহলী ভাববে, এটা সে চাইছিল না।

'এইবার আপনাদের সব বুঝিয়ে দিচ্ছি,' বললে সে, কাজ তার শেষ হয়ে গেছে। 'খুব সোজা, ছাতার ডগাটা ধরতে হবে ধ্রুব তারার দিকে...'

'নে হয়েছে,' আস্তে করে বললে লোকটা, 'বোঝাবার দরকার নেই। আমি নিজেই ও যন্তরটা বুঝি।'

বিব্রতভাবে চুপ করে গেল ছেলেটা। কথাটা তার বিশ্বাস হল না, ভাবলে নিশ্চয় কিছু বোঝে নি।

'খুব সোজা,' অনিশ্চিতভাবে বললে ছেলেটা। 'শুধু মনে রাখতে হবে ধ্রুব তারাটা কোথায়...'

'জানি রে,' বললে ওই বিচিত্র লোকটা, 'জানি রে, খোকা। সেইটেই সব নয়। তুই কিন্তু অনেক কিছু হিশেব করিস নি।'

'কী হিশেব করি নি?' ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে ছেলেটা। তাকে 'খোকা' বলায় রাগ করার কথা পর্যন্ত সে ভুলে গেল।

'আকাশ খুব জটিল জিনিষ। কী জানিস, নক্ষত্রদের অবস্থান শুধু দিনের সময় অনুসারে নয়, বছর জুড়েও বদলায়। তাছাড়া অনুপাতগুলো তোর খুব যথাযথ হয় নি। তাছাড়া, মনে আছে কি তোর, ধ্রুব তারাটা ঠিক কোথায়? শুধু মানচিত্র মনে থাকলেই হয় না, আকাশটাকেও মনে রাখতে হয়।'

'তার মানে সব বৃথা...' ক্ষীণ কণ্ঠে বললে ছেলেটা, 'তাহলে কেন আপনি...'

'বৃথা নয়,' জবাব দিলে অপরিচিত। 'তাহলেও সাবাস তোকে। আর তোর ভুলগুলোয় আমার ক্ষতি হবে না... তাছাড়া ধ্রুব তারা তো সেখানে থাকবে না।'

''সেখানে' মানে কোথায়?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ছেলেটা।

লোকটা বললে:

'কুমেরুতে।'

...চুপ করে গেল ছেলেটা। এরকম একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে যাই হোক কিছু কথা বলা সহজ নয় তো। যাবে কুমেরুতে। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। যেখানে অন্য রকম সব তারা। ধ্রুব তারা যেখানে দেখা যায় না।

'আপনি... ঠাট্টা করছেন না তো?' ফিসফিস করলে ছেলেটা।

'উঁহুঁ,' বললে কুমেরুগামী লোকটা। 'অবিশ্যি ফুটো করা এক ছাতা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হাস্যকর লাগতে পারে। কিন্তু কী জানিস... হঠাৎ ছাতাটা খুলে আমাদের উত্তরের তারাগুলো দেখে নেওয়া মন্দ হবে না। সত্যি বলছি। যতই বলি, সত্যিকারের তারাগুলোর মতোই ওরা দেখাবে।'

'হাত তোর পাকা,' বললে মেয়েটা।

সবচেয়ে প্রধান কথাটা জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছিল না ছেলেটা।

'রাগ করবেন না যেন,' মিনতি করলে ছেলেটা, 'কেমন? মানে বলছিলাম কী... আপনি আপনার নামটা বলবেন?'

'একতরফা জেরা,' একটু হাসলে লোকটা। 'তা কী আর করা যায়...'

এবং নামটা বলল।

'ইস্!' ফিসফিসিয়ে উঠল ছেলেটা। আর এই 'ঈসে' এবার কোনো উপহাস ছিল না, ক্ষোভ ছিল না, ছিল শুধু বিস্মিত, বিহ্বল হাসি। এ নামটা ছেলেটার মনে ছিল।

না, ঠিক কখন এবং কোথায় সে নামটা শুনেছে তা তার মনে নেই। কিন্তু নামটা মনে আছে। স্মৃতিতে তার এ নামটা জড়িয়ে আছে তার প্রিয় জিনিসগুলোর সঙ্গে—দূর দূর দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে লেখা বই, দুর্বোধ্য সব গালভরা নামের সামুদ্রিক ঝড়, গ্রহ তারা আর পৃথিবীর যত প্রহেলিকার সঙ্গে। ও নামটা যেন কোনো এক আধভোলা সুন্দর গানের কথার মতো অনেক কিছু মনে পড়িয়ে দিতে থাকল তার। এমন কি যা কখনো দেখে নি, তাও মনে পড়ে যায়, ছবির মতো ফুটে ওঠে। খুব খুব করে যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে দেখা যাবে বৈকি বিষুবরেখার কাছে সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে রুপোলী উড়ন্ত মাছ, দেখা যাবে সেই সমুদ্রের খাঁড়িগুলো যেখানে মায়াবিনীর অশান্ত ডাকটা অবিরাম প্রতিধ্বনিত হয়ে চলে, দেখা যাবে ব্যাটিস্ফিয়ারের* প্রশস্ত আলোয় উম্ঘাটিত সমুদ্রের গভীরতার ঝিকমিকে গোধূলি, বরফ-ভাঙা জাহাজ আর স্টিমারের তুহিন মাস্তুল, যাচ্ছে তারা সেই দেশে যেখানে বরফের পাহাড় ধীরে ধীরে তীর থেকে আলাদা হয়ে ক্রমবর্ধমান গর্জনে তলিয়ে যাচ্ছে সবুজ মহাসিন্ধুতে...

'আমি জানি... আপনি ক্যাপ্টেন,' আস্তে করে বললে ছেলেটা। জোরে কথা বলার

---

* বিশেষ এক যন্ত্র যাতে পর্যবেক্ষক সমুদ্রের গভীরে নেমে যায়।

ইচ্ছে হল না তার, যেন ভয় পাচ্ছিল এই আশ্চর্য, রহস্যময় সাক্ষাতের আনন্দ যেন তাতে নষ্ট হবে। 'আপনি ক্যাপ্টেন...'

'তা, বলতে কি...' শান্তভাবে বললে ক্যাপ্টেন, 'হ্যাঁ, এক দিক থেকে সত্যিই ক্যাপ্টেন।'

'পেঙ্গুইন দেখেছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করেই ভয়ানক বিব্রত লাগল তার, এ যে একেবারে ছেলেমানুষী প্রশ্ন, ষষ্ঠ শ্রেণীতে যে পড়ে তার পক্ষে মানায় না, মানায় ওই খোকাটাকে, যার জন্যে সে তারা এঁকে দিয়েছিল।

ক্যাপ্টেন হাসল।

'তোর অভিনন্দন জানিয়ে দেব ওদের। খুশি হবে। নাকি বরং এক জোড়া পেঙ্গুইনছানা এনে দেব তোকে। কী বলিস?'

এ ঠাট্টায় অপমান বোধ করল না ছেলেটা। কল্পনায় তার ভেসে উঠল মজাদার সব পেঙ্গুইনছানা, লাল লাল থাবার ওপর ভারিক্কী চালে থপ থপ করে হাঁটছে। ভেবে হেসে উঠল সে। হাসল ক্যাপ্টেন। মেয়েটাও...

স্টপ থেকে খানিকটা দূরে, অন্ধকার মোড়টার কাছে ঝনঝন করে উঠল ট্র্যামগাড়ি, দেখা গেল তার আলোভরা জানলা, তার থেকে ছিটকে উঠল সবুজ ফুলকি। লাল সবুজ আলো জ্বলা সেই পনের নম্বর ট্র্যাম, যার জন্যে অপেক্ষা করছিল ক্যাপ্টেন।

'আর এক মিনিট,' ভাবল ছেলেটা।

বড়ো জোর দুই মিনিট, যদি ট্র্যাফিক সিগন্যালটার কাছে ট্র্যামটা খানিকটা থামে।

থামল না ট্র্যামটা।

তাহলেও আনন্দ গেল না ছেলেটার। দুঃখের হালকা একটু ছায়ায় তা যেন নরম হয়ে উঠল। ঘরের জ্বলজ্বলে বাতির ওপর সবুজ শেড পরালে যেমন হয়।

'এই তো, আর কি,' ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বললে ছেলেটা। বলতে চেয়েছিল, 'এই তো আপনাদের ট্র্যাম এসে গেছে,' কিন্তু ভারি লম্বা কথাটা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ক্যাপ্টেন। ছেলেটা টের পেল তার বাঁ কাঁধে কুর্তাটা যেন মুহূর্তের জন্যে ভারি হয়ে উঠেছে: হাত দিয়ে চাপ দিল ক্যাপ্টেন।

'যদি চাস, তোর জন্যে, ধর, ওদেশের কালো নুড়ি নিয়ে আসব? সত্যিকারের কুমেরুর নুড়ি। জায়গাটায় রকমারি জিনিস তো বেশি নেই।'

এটা কিন্তু ঠাট্টা নয়।

'নিশ্চয় আনবেন!' উচ্ছল গলায় বললে ছেলেটা।

'ভুলে যাবি না তো? ফিরব ছ' মাস পরে।'

'আমি?' বললে ছেলেটা, 'ভুলে যাব?'

'তাহলে ঠিকানাটা শোন...'

'দরকার নেই!' প্রায় যেন ভয় পেয়ে গেল ছেলেটা।

সোজাসুজি ঠিকানা নিয়ে রাখার ইচ্ছে হল না তার। ছয় মাস পরে ও নিজেই খুঁজে বার করবে ক্যাপ্‌টেনকে। সেটা হবে আরো ভালো। আর খুঁজে বার করতে সে পারবে বৈকি। এমন লোককে খুঁজে বার করা কি আর অসম্ভব?!

এসে থামল ট্রাম, দুয়োর খুলে গেল।

'দেখবেন, আমি আপনাকে খুঁজে বার করব,' তাড়াতাড়ি করে বললে ছেলেটা।

'তা জানি। নক্ষত্রগুলোর জন্যে ধন্যবাদ।'

ক্যাপটেন মেয়েকে আগে উঠতে দিয়ে তারপর নিজে উঠল পাদানিতে।

'আরে শোন, নে এটা!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, বাপের কাঁধের ওপর দিয়ে তারা না-আঁকা ছাতাটা বাড়িয়ে দিলে, 'নে, নে, আমরা থাকি স্টপের কাছেই।'

'নে,' বললে ক্যাপ্‌টেন।

'কী দরকার? আমি তো এমনিতেই ভেজা মোরগছানা।' কথাটা বলেই ভয় হল ছেলেটার: মেয়েটা হয়ত ভাববে এখনো সে তার ঠাট্টাটা ভোলে নি? 'বৃষ্টিটা মোটেই ঠাণ্ডা নয়,' তাড়াতাড়ি করে সে বোঝালে, 'কিচ্ছু হবে না।'

ভয়ঙ্কর ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল দরজাটা, এইবার তা বন্ধ হবে।

'নাম কী তোর?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্‌টেন।

'স্লাভকা।' বলে সে ঝকঝকে রাস্তার ওপর পা বাড়ালে বাড়ির দিকে।

বড়ো বড়ো উষ্ণ ফোঁটায় বৃষ্টি ঝরছিল তার ওপর, প্রতিটি ফোঁটায় আকাশ থেকে বয়ে আনা আলোর এক একটা ফুলকি। ঠিক যেন ওই ওপর থেকে তারা এক একটা ক্ষুদে ক্ষুদে নক্ষত্র ধরে এনেছে, নির্মেঘ রাতের আকাশে যা ছড়িয়ে থাকে ধুলোর মতো।

এগুল স্লাভকা, হাসল, নক্ষত্রের ফোঁটাগুলো ধরতে লাগল ঠোঁট পেতে।
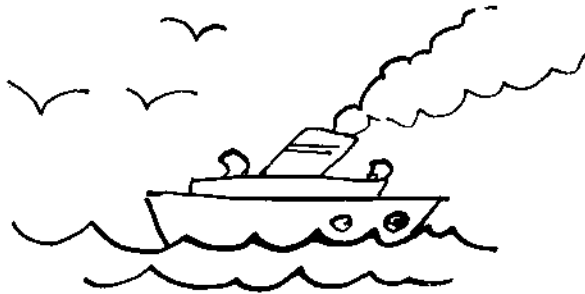
পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন

২১, জুবোভ্‌স্কি বুলভার

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

ছবি এ'কেছে মস্কোর ছাত্রী চোদ্দ বছর বয়সের ওল্যা প্‌শ্‌কারিওভা